সৃষ্টি-সরণী

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

অণিমা প্রকাশনী
১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতৃদেবের

শ্রীচরণতলে

এক বৃদ্ধা ময়ূরাক্ষীর তীরে গাছের সারিতে দাঁড়াতেই মুখটা লাল হয়ে যায়। খুবই পরিচিত দুজন গভীরভাবে প্রেমালাপে মসগুল। তারা হয়তো তাকে দেখে নি। আর দেখলেও হয়তো না দেখার ভাণ করে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হেসেই ফেলে। কে যেন তার কানে কানে বলে—একদিন তোমারও ছিল। এই গাছ ছিল। এই নদী ছিল। এইভাবেই নদীর জল থেকে লাল সূর্যের আলো মিলিয়ে যেত। নেমে আসত অন্ধকার। সবই আছে, শুধু হারিয়ে গেছে এই মনটা।

মন্তব্য না করে বৃদ্ধা চলে যায় স্নান করতে। যুবক-যুবতী দুজন মন্তব্য না করে পারল না—সকলেই বলে আমাদের সময়টা খুব ভাল ছিল।

যুবতী বলল—আমিও একদিন বলব আমরা কত ভাল ছিলাম, সমাজের জন্য কত চিন্তা করেছিলাম, কি দিন এল!

কথার মধ্যেই সূর্য সেদিন শেষবারের মতো হাত নেড়ে বলল—বাই-বাই।

একটা দিন চলে যায়। একটা দিন চালাতে যে কি কষ্ট হয় সেটা বোঝে জীবানন্দ মিত্র। ছোট একটা সাইকেল মেরামতির দোকান, ছেলে মেয়ে স্ত্রী সহ চারজনের সংসার।

দোকানটি তার একমাত্র ভরসার আশ্রয় নয়। তাই কখনও বেরিয়ে পড়ে তিলের খাজা নিয়ে, কখনও শুকনো মাছ নিয়ে। ভাঙা সাইকেলটি হয় তার সঙ্গী। কলোনীর মানুষ তাকে ভালবাসে। কারণ একটা গুণ তার আছে, সেটা সততা। শত অভাবেও সে দৃঢ়। স্পষ্ট কথা বলার মতো ক্ষমতা তার আছে।

ময়ূরাক্ষী নদীর ধার বরাবর নানা ধরনের গাছে ভর্তি। সরকারের

দান, বন সৃষ্টি প্রকৃতি করে নি, প্রকৃতির গাছগুলো অনেকদিন আগেই মানুষের কাজে লেগে গেছে! সি. আর. দাস কলোনীর মানুষেরা বলে —দূরের আদিবাসীরা সব গাছ শেষ করে দিয়েছে। সাঁওতালরা কাজ করতে আসত বা এখনও আসে মিলে কাজ করতে। ফিরে যাওয়ার সময় জ্বালানীর জন্য একটা করে গাছ কেটে নিয়ে যেত। কিন্তু এখন পারে না। তার কারণ এখন বসতি হয়েছে, দোকান হয়েছে। মানুষের দৃষ্টি এসেছে প্রকৃতির দিকে। প্রয়োজন অনুভব করেছে মানুষ।

যেমন ভাবে মানুষ বুঝতে পারে সংসারকে, বুঝতে পারে পরিবেশকে, ঠিক সেই সঙ্গে পরিবেশ সুস্থ রাখতে গাছকেও ভালবাসে। কিন্তু অশুভ শক্তি কি থাকে না?

জীবানন্দ কোনদিনই ভাবতে পারে নি তাকে এইভাবে সাইকেলের দোকান করে দিন কাটাতে হবে। একটা কারখানায় সে চাকরি করত, আর পাঁচটা কর্মচারীর মতো তার জীবন ছিল স্বচ্ছল। জীবানন্দ আর পাঁচটা কর্মচারীর মতো বাড়ী, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স করে নিতে পারত। অসৎ কিছু কর্মচারীর চুরির জন্য কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেশ কিছু কর্মচারী তাতে বড়লোক হয়। পারে নি কোন অশুভ শক্তি জীবানন্দের মতো 'নগণ্য' কর্মচারীটিকে গ্রাস করতে। স্ত্রীর প্রলোভন, ঝগড়া, অশান্তি সব কিছুকে তুচ্ছ করে আজ জীবানন্দ তেল-খাজা বিক্রেতা।

বাঁচতে হবে! বাঁচাতে হবে! সংগ্রামময় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাকে হাতুরীর আঘাত দেয়। হৃদয় মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা হয়তো তার নেই, তবুতো দিন চালাতে হবে! সাহায্যকারী হিসেবে একমাত্র পুত্র কানাই।

দিনটা মোটেই ভাল নয়। আকাশ মেঘে ঢাকা। বাবা এবং ভাই-এর খাবার নিয়ে যেতে দেরী হয়ে যায় মাধবীর। নানা রকম গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তা। হাঁটা রাস্তা, সূর্যের আলো তেমন প্রবেশ করে না।

মেয়ের দেরিতে জীবানন্দ রেগে ওঠে। চিৎকার করে বলে ওঠে —বাড়ীতে বসে মজা করছিলি ?

স্বাভাবিকই, সকালে চা-রুটি খেয়ে আসার পর বেলা একটায় ভাত। হাড়ভাঙা পরিশ্রম। আর টিফিন করার মতো পয়সা রোজগার হয় না।

মাধবীর চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে—বসাক কাকু বলল চাল দেবে না, অনেক বাকী হয়ে গেছে। অনেক অনুরোধ করে চাল এনেছি, রান্নায় তাই দেরি।

জীবানন্দের মুখটা লাল হয়ে ওঠে—কত বাকী আছে ?

—প্রায় একশ' টাকা।

—এক-শ··· !

ভাতের গ্রাসটি মুখ থেকে থালায় পড়ে যায়। চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। সারাটা মুখ ঘামে ভরে ওঠে—ঠিকই তো, কেন দেবে ধার ! আমি···অপদার্থ !

মাধবীলতা বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারে। সান্ত্বনার সুরে বলে— তুমি খেয়ে নাও বাবা। তুমি অত চিন্তা করো না।

—আমি না করলে কে করবে ? তোরা আমার সংসারের অভাব তাড়াতে পারবি ?

মাধবীর ক্ষমতা জীবানন্দ তো জানে। ষোল-সতের বছরের যুবতীর কাছে তার প্রত্যাশা অবশ্যই শূন্য। শুধু চিন্তার পাহাড়টা তাকে অন্ধকার দান করেছে।

কানাই চুপ করে থাকে। মাধবীর চোখ থেকে যখন দুই-এক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে, তখন সে তার ভাষা হারায়।

ঠিক তৃপ্তিভরে না হলেও খাবার খেয়ে নেয় জীবানন্দ। ভাঙা টিনের বাক্স থেকে কুড়ি টাকার একটা নোট বের করে বলে—রাতের খাবার তৈরী করবি।

হাতে টাকাটা নিয়ে মাধবী আবার সেই পরিচিত রাস্তা ধরে। বাবার মুখটা তার সামনে বারে বারে ভেসে ওঠে। গাছে গাছে

পাখীদের কলরব তার কানে প্রবেশ করে না। মানুষের কত সুখ, লোকের বাড়ীতে কত খাবার! তার মনে হয়, সবাই কি অসৎ? সকলেই কি পরিশ্রমী? সকলের প্রতি ভগবানের কত দয়া! অথচ তাদের প্রতি ভগবান কেন এত বিরূপ?

রাস্তা বেশী নয়। যাওয়ার পথ খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যায়। ধরাস করে থালাগুলো নামিয়ে বলে—ভগবান আর কত কষ্ট দেবে!

কানে আসে কয়েকটি কথা—কেন, তোর আবার কি হল? ঝগড়া করেছিস?

নীরবতার পর নীরবতা। তাই কাছে এসে সাবিত্রী বলে--বুঝতে পেরেছি, সর্বনাশটা ডাকল তো সাধ করে, এখন ভোগ।

একটু দূর থেকে ভেসে আসতে থাকে সেই পরিচিত বাঁশী, রবীন্দ্রনাথের সেই সুর—"সুখে আমায় রাখবে কেন···"

সাবিত্রীর কণ্ঠে আবার বিরক্তি—সংসার করতে কে বলেছিল?

মাধবীর মনটা তখন রোমান্সে, সাবিত্রীর কথা সে মোটেই শুনতে পায় না। রবীন্দ্রসংগীতের অনেক সুর তার শোনা হয়ে গেছে। ভাল লাগত না আগে। কিন্তু এখন এত ভাল লাগে যে সমস্ত গানের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পায়। আধুনিক, শ্যামাসংগীত সব গানকেই রবীন্দ্রসংগীতের সুরে গায়, গলায় অবশ্য মাধুর্য নেই। কিন্তু গাইতে দোষ কি! আনন্দের মধ্যে মানুষ আসে। পদ্মের কুঁড়ির মতো প্রস্ফুটিত হয় মানুষের জীবন, এরপর খেলাঘর—তারপর খেলাঘর—অতঃপর মহাপ্রস্থান।

জীবানন্দের বাবা ছিল বড় ধরনের মাতাল। জীবানন্দের মায়ের মৃত্যু হয়েছিল তার বাবার চপেটাঘাতে। হালিশহরে একটা বাড়ীও ছিল। কিন্তু পিতৃঋণে সেই বাড়ীটা চলে গেছে। তারপর মামা দুর্গা দাসগুপ্তের অনুপ্রেরণায় বাম রাজনীতিতে প্রবেশ। দুর্গাবাবু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। তারপর সক্রিয় বাম রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ। তাঁরই সুপারিশে কারখানায় চাকরি। জীবানন্দ খুবই

কাছ থেকে দেখেছিল—একজন সৎ আদর্শনিষ্ঠ কমিউনিষ্ট নেতা উচ্চ পদে আসীন থেকেও কি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করল। জীবানন্দ তার মামার কাছ থেকে একটি গুণ হাড়ে হাড়ে গ্রহণ করেছিল, সেটা হল সততা। সংগ্রামী জীবানন্দ পরাজয় বরণ করে নি বাস্তবের কাছে। মূল্যায়ণের প্রতীক্ষায় আজও সে ময়ূরাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সূর্য ডুবে যায় পশ্চিম দিকে। দোকান বন্ধ করে জীবানন্দ বাড়ী ফেরে। গায়ের কালো কালিমাখা জামাটা খুলে এসে বলে—মাধু, একটু জল দে মা।

জলের গ্লাসটি হাতে ধরিয়ে বলে—নাও।

খুবই তৃপ্তি ভরে জল খেয়ে জীবানন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

সাবিত্রী যেন কিছু বলার জন্য তৈরী হয়েই ছিল—দিন তো চলে যাচ্ছে, মেয়ের কিছু ব্যবস্থা কর।

জীবানন্দের মাথাটা আবার ঘুরে যায়। চিন্তার আগুনে নিজেকে আবার নিক্ষেপ করে!

মাধবী ততক্ষণে বাড়ীর বাইরে সর্বজয়ার গাছগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। তার অব্যক্ত কথা মনের মধ্যে ঘুরতে থাকে। সে তার বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে চায়—আমার জন্যে চিন্তা করো না।

তার কানে আবার বেজে ওঠে রবীন্দ্র সংগীতের সুর। সেই বাঁশি।

সাবিত্রীর কথাগুলো তার কানে আবার আসতে থাকে—নিগুণা পুরুষ। সততার কি মূল্য আছে? ভবিষ্যত অন্ধকার। তোমার জন্যে আমার জীবনটাও পুড়ে খাক্ হয়ে গেল।

মাধবী শুধু প্রকাশের ব্যথায় আকুল হয়ে উঠল।

দুই

—জান অনাদিদা, মা বাবাকে দারুণভাবে বিব্রত করছে।

—কেন? তুমি তোমার মাকে আমাদের কথা বল নি?

—তা হলে মা আমাকে ঝাঁটাপেটা করবে।

—তোমার মা এখনও অন্ধকারে আছে?

—কিচ্ছু বুঝতে পারি না।

একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে কথা হয় অনাদি এবং মাধবীর মধ্যে। অনাদি সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী। বাড়ী গোবরডাঙ্গা। থাকে মাধবীদের কলোনীতে। স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পোষ্টিং। মাধবীর সঙ্গে সম্পর্কটা মধুর। মাধবীদের বাড়ীর অবস্থা সে জানে। অনেক সময় মাধবীকে সে অর্থ সাহায্য করতে চায়। কিন্তু বাবার ভয়ে মাধবী নিতে অস্বীকার করে।

অনাদির মতো একজন সরকারী কর্মী মাধবীর সঙ্গে প্রেমে লিপ্ত হবে সাবিত্রী স্বপ্নেও ভাবে না। তাই কেউ কেউ তাকে মাধবী সম্পর্কে কিছু বললে গুরুত্ব দেয় না।

বলে—আমার মেয়ের কি সেই রকম ভাগ্য যে অনাদিবাবুর মতো অত সুন্দর ছেলেকে ভোলাতে পারবে?

কিন্তু নানা জন তবুও নানা কথা বলে। কান ভারী করে। জীবানন্দ যে জায়গায় মুক্ত পুরুষ, সাবিত্রী সেখানে হতাশ! শুধু কানাই-এর কথাহীন মুখটা দিদির ভবিষ্যত খোঁজে। মাধবী একটা জায়গায় স্থির। তার ধারণা, তার শিবরাত্রির উপোস সার্থক।

খুব সহজভাবেই এই প্রেম গড়ে উঠেছিল। মাধবীর চেহারা খুবই সুন্দর। প্রত্যেক দিন একাকী বাবা এবং ভাই-এর জন্য ভাত নিয়ে যায়। নদীর ধারে বসে থাকে অনাদি। অবশ্য সব দিন নয়। তার কাজের চাপ কম। কাজে না গেলে বা সকালে ডিউটী করে এসে বসে পড়ে নদীর ধারে বাঁশি নিয়ে।

মাধবীর সরলতাটা সে তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। বুঝত অভাবগ্রস্থ মেয়েদের কাছে চাকরীজীবী ছেলে খুবই লোভনীয়। তবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় চাকরীজীবীরা সকলের কাছেই লোভনীয়। এক সময় জমিদারী যুগ ছিল। মানুষ জমিজমা দেখত। এখন দেখে না। বিষয় এখন বিষ। তবে অনাদির আর একটা বড় গুণ সে

একজন শিল্পী। তার রবীন্দ্র সংগীতের সুর পাগল করে তোলে।

রবীন্দ্র সংগীতের সঙ্গে মাধবীর তেমন পরিচয় ছিল না। আগেই বলেছি, ভাল লাগত না। কিন্তু অনাদির সঙ্গে তার 'সম্পর্ক সৃষ্টি' হওয়ার পর রবীন্দ্র সংগীত তার প্রিয়। কারণটা হচ্ছে অনাদিকে ভালবাসতে হলে তার প্রিয় গানকেও ভালবাসতে হবে। ভাল যে বাসতেই হবে, রবীন্দ্র সংগীতকে ভালবাসতেই হবে। এ সবগুলো ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু মাধবীর ধারণা—রবীন্দ্র সংগীত যদি ভাল না বাসি তো অনাদি চটে যাবে।

বেলা বারোটা হবে। মাধবী বাবা এবং ভাই-এর জন্য ভাত নিয়ে যাচ্ছে।

তার কানে ভেসে আসে আবার সেই বাঁশির সুর। যদিও কলোনীর মানুষেরা খুব ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু মাধবীর জীবনের অনেকটাই জুড়ে আছে অনাদি।

মাধবীকে দেখে অনাদির বাঁশি বন্ধ হয়ে যায়। আসতে আসতে কাছে গিয়ে মাধবী বলে—তুমি একটু বস। আমি যাব আর আসব।

প্রথম পরিচয়ের দিনটা ছিল কালীপূজো। গায়ে পড়ে আলাপ করে অনাদি। সেদিনের পরিচয়-এর মধ্যে ভাষাটা ছিল 'আপনি'-'আপনি'। কিন্তু অনাদি খুবই কাছের করে নিয়েছিল দ্বিতীয় দিন নদীর ধারে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। অনাদির উদ্দেশ্য ছিল আলাদা। গরীব অসহায় মেয়েটিকে কয়েকদিন মাতিয়ে মজা লুটে কেটে পড়বে। কিন্তু অনাদি শেষ পর্যন্ত ততদূর এগোতে পারে নি। মাধবীর সরলতার মধ্যে এমন একটি জিনিস সে লক্ষ্য করে, যাতে তার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে নি।

জীবানন্দ মাধবীকে দেখেই বলে—তোকে বেশ চঞ্চল লাগছে। কি ব্যাপার বলতো ?

মাধবী একটু এড়িয়ে যায়।

—ঝগড়া-টগরা কিছু হয়েছে নাকি ?

বাবার কথায় কান না দিয়ে বলে—তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।

তাড়াতাড়ি না হলেও খুব একটা দেরি হয় না তাদের। থালাগুলো তাড়াতাড়ি ধুয়ে গামছায় বেঁধে নিয়ে আবার রাস্তা ধরে।

এক গাল হেসে অনাদি বলে—খুব তাড়াতাড়ি ফিরলে!

মাধবী মুচকি হাসে।

—কাল তোমাকে ভিডিও হলে দেখলাম।

--হ্যাঁ, হ্যাঁ গেছিলাম। তুমি?

--আমিও গেছিলাম। অবশ্য তোমার যাওয়া দেখে।

—কেন? আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয়? তাই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিলে, কথা বললে না।

—ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম।

—অন্য রকম মানে?

—সেটা তোমাকে শুনতে হবে না।

– শুনেছি, তবে বিশ্বাস করি নি।

অনাদির মুখটা লাল হয়ে যায়। বুঝতে পারে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত।

—কি শুনেছ? বেশ রাগান্বিত হয়ে বলে অনাদি।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে মাধবী। পাখীরা চিৎকার করেই যায়। কত লোক পেরিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে। কত লোক স্নান করে নদীতে। অনাদি-মাধবীর বসার জায়গা নদীর ধারে একটা ছোট পুকুর পাড়ে বট বৃক্ষের ছায়ায়।

মাধবী বলে—অনাদিদা, আর বসব না। বেলা প্রায় তিনটে হল। মা বকবে।

হাত ধরে অনাদি বসায়—কি শুনেছ, একটু শুনতে চাই।

—চাইলেই বলতে হবে?

—-বল না।

—তুমি শচীন মাষ্টারমশাই-এর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছ।

—কোথায় শুনলে?

—আমি উঠি। অনেক দেরী হয়ে গেল।

মাধবী চলে আসে বাড়ী। অনাদি অবশ্য চুপ করে বসেই থাকে।

অনাদির চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। তার ফেলে আসা জীবন খুবই কলঙ্কময়। বহু ঘটনার সাক্ষী সে। সে একজন স্কুল মাষ্টারের সঙ্গেও গভীর ভাবে জড়িত। সংবাদটা মাধবী জ্যোৎস্না বৌদির কাছে শোনে। কিন্তু মাধবী জীবনে আর কাউকেই ভালবাসে নি। সে একমাত্র অনাদিকেই ভালবেসেছে। অনেকের বাধা, শত গঞ্জনা সহ্য করেও মাধবী অনাদির পিছন ছাড়তে নারাজ।

সমাজের দুটি ছবি। একদিকে ধনী, অন্যদিকে দরিদ্র। একদিকে পুরুষ, অন্যদিকে নারী। একদিকে বৃষ্টি, অন্যদিকে অনাবৃষ্টি। একদিকে চরিত্রবান, অন্যদিকে চরিত্রহীন। একজন চরিত্রহীন কর্মচারীর জীবন নিয়ে লেখার মানসিকতা থাকলেও কোথাও কেউ যেন বাধা দেয়। কিন্তু লিখতেই হবে। না হলে সেটা হবে অন্যায়।

অনাদির আরও গুণ বা দোষ আছে। নকশাল আন্দোলনের নেতা ছিল অনাদি, তখন সে বিশ্বভারতীর ছাত্র। পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছিল। বাংলার ছাত্র ছিল অনাদি। ওখান থেকেই রবীন্দ্রপ্রীতি। নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পর অনাদি দীর্ঘদিন গৃহছাড়াও হয়েছিল। বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় সে ঘুরেছিল। সংগঠন করত। তবে তাকে কোন জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে দেয় নি তার চরিত্র। বড্ড বাজে চরিত্রের মানুষ। এর জন্যে তার মাঝে মাঝে চিন্তা হয়। ফাঁকা মাঠে বসে কখনও ভাবে, তার উদ্দেশ্যমূলক লাভ তার অগ্রগতিতে বিরাট বাধা। অনেক মেয়ের দুর্বলতার সুযোগ সে নিয়েছে। তার ভাল কাজ বলতে কি বলব! যদি কেউ নকশাল আন্দোলনকে ভাল বলে, তবে নকশাল আন্দোলন ভাল কাজ, আর তার গুণ বলতে বাঁশি বাজান।

শচীন মাষ্টারমশাই-এর মেয়ে মীনাক্ষী কলোনীর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। বয়স মাধবীর চেয়ে অনেক বেশী। অনাদির চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট। কলোনীতে গুজব, মীনাক্ষীর সঙ্গে নাকি অনাদি দীঘা গিয়েছিল। একই হোটেলে ছিল। সে ঘটনা মাধবী জানে না। মীনাক্ষীও

জানে না মাধবী-অনাদির সম্পর্কটা যে খুবই মধুর। মাধবীর সামনে যে পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে সেটা অভাবের। মাধবী ভেবেই নিয়েছে তার আর যাওয়ার রাস্তা নেই। কারণ তার বাবা বিয়ে দিতে পারবে না। তাই অনাদিকে সামনে রেখে যে কদিন আনন্দে কাটানো যায়।

মীনাক্ষীর ধারণা হয় না বা কোন দিনই অনাদিকে জিজ্ঞাসা করে না মাধবীর সঙ্গে তার কি রকম সম্পর্ক। ধারণাটা হয় না এই কারণেই যে অনাদির থেকে মাধবীর বয়স অনেক কম। দ্বিতীয়ত মাধবীরা খুবই গরীব, সুতরাং অনাদি কোন দিনই তার সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবে না। তৃতীয়ত মাধবী সরল, প্রেম করার মতো তার প্রতিভা নেই।

তবুও মীনাক্ষী কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করেই বসে—আচ্ছা অনাদিদা, তোমার সঙ্গে মাধবীর কেমন পরিচয় আছে?

একটু হতচকিত হয়ে অনাদি বলে—কেন বলতো?

—না, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—মেয়েটা খুব সরল, গরীব, আমি তাকে একটু অন্য চোখে দেখি।

—মানে?

—একটু স্নেহ করি।

—অন্য কিছু নয় তো?

—ধুৎ পাগলি, বাংলাদেশে আমাদের একই গ্রামে বাড়ী ছিল, আমাদের আত্মীয়ও বটে।

মীনাক্ষী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে—সত্যি, জীবানন্দদা কী ধরনের লোক। এ যুগে কি সততার মূল্য আছে?

—তুমি ভুল করছ মীনাক্ষী, পৃথিবীর কিছু মানুষকে ভাল হতেই হবে। তাদের মহাপুণ্যে পৃথিবী চলবে। আমার তো মনে হয়, যদিও আমি রিসেন্ট এসেছি, এই কলোনীর সব চাইতে সৎ লোক জীবানন্দ।

—অবশ্যই। আমিও সেটা স্বীকার করি।

—খুবই মায়া লাগে। মাঝে মাঝে দেখি বসাকবাবু কি ভাবে

বকাঝকা করছে। দোকান দেয় না। ঐ বড় মেয়েটা মুখ লাল করে ঘুরে আসছে।

মীনাক্ষী অনাদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুবই গভীর ভাবে চিন্তা করে। গভীরতা মাপার চেষ্টা করতে থাকে।

—অনাদিদা একটা বিষয় হয়তো ভুল করছ।

—কি?

—ভগবান ওদেরকে এই ভাবেই সংসার যাত্রা নির্বাহ করার জন্য পাঠিয়েছেন।

ততক্ষণে অনাদি বুঝতে পারে মীনাক্ষীর মনের অবস্থা। কথাটা খুবই সহজে ঘুরিয়ে দেয়—হ্যাঁ-হ্যাঁ, জীবানন্দের কিছু কিছু দোষও আছে।

মীনাক্ষীর সঙ্গে অনাদির বেশী কথা হয় তার স্কুলে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ইঞ্জেকশন দিতে যায়। পলিও ক্যাম্প করে। কখনও কখনও অপারেশন ক্যাম্পও করে। কাজ না থাকলেও যায় শুধু গল্প করার জন্য। মীনাক্ষীদের স্কুল অনাদির খুবই প্রিয়। আবার মাঝে মধ্যে চলে যায় কোন ধর্মস্থানের হোটেলে।

মাধবী এই জায়গায় খুবই পবিত্র। বাবার একটা গুণ সে নিয়েছে বা পেয়েছে পৈত্রিক সূত্রে, সেটা হল পবিত্রতা। সে চিফ্ লেডি নয়।

ভাঙা সাইকেলে করে এসে অনাদি দাঁড়ায় মাধবীদের বাড়ীর পাশে। সাবিত্রীকে সে মাসীমা বলে, জীবানন্দকে দাদা। মাথা থেকে শান্তিনিকেতনের টুপিটা খুলে বসে উঠোনেই, মোরার উপর।

সাবিত্রী বলে—আজ কোথায় যাবে?

—আর বলবেন না—আজ সাক্ষরতার মিটিং আছে।

—কোথায়?

—গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। মাথা-মুণ্ডু কিছুই হয় না। আমাদিকে সভাধিপতি চোখ রাঙাচ্ছেন, কাজ করতেই হবে।

—কিন্তু কাজটা তো খুবই ভাল।

—ভাল তো ঠিকই, কিন্তু খুবই কঠিন। পারা যায়?

—অ্যাকচুয়ালি কি জান, এই তোমাদের কাজ না করে করে কাজ করতে ইচ্ছা হয় না।

—তা নয়, এগুলো আন্দোলনমুখী ওয়ার্ক। যেমনভাবে আমরা নকশাল আন্দোলন করতাম। যেমন ধরুন বিদ্যাসাগর মশাই বিধবা বিবাহের জন্য করেছেন। এর জন্য দরকার কিছু পাগলের।

—তুমিই হও না পাগল।

উচ্চৈস্বরে হেসে ওঠে অনাদি। তারপর বলে—মানসিকতা নষ্ট হয়ে গেছে, আর হবে না। এক সময় বয়স ছিল। আন্দোলন করেছি।

—এমন আর কি বয়স হল?

—মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়ে গেছে।

মাধবী একটু চা করার জন্য উসখুস করতে থাকে। কিন্তু চা চিনি কিছুই নেই। অনাদি যেন মাধবীর চোখ দেখেই বুঝতে পারে—মাধবী, আমি কিন্তু চা খাব না। এখনই টিফিন করে এলাম।

সৌজন্যবোধ সাবিত্রীর আছে। বলল—তাই বললে হয়?

—না না মাসিমা, একেবারে মারা যাব।

মাধবী কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অনাদি বলে—দেখুন না, ছুটি পাচ্ছি না। ভাবছি একটু বেড়াতে যাব।

মাধবী তাড়াতাড়ি বলে—কোথায় যাবে?

—পুরী যাব।

—আর কে যাবে?

—একাই যাব।

সাবিত্রী কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে—একা একা বেড়াতে যাওয়া মানায় না।

অনাদি একটু হাসে। তারপর বলে—সে কপাল আর হবে না।

মাধবীর হৃদয়-তারে রোমান্সের সুর বেজে ওঠে। দুঃখের রাগিনীতে

অনাদির বিদায় ধ্বনি স্পন্দিত হয়। কোন অসৎ কাজে হয়তো অনাদি যাচ্ছে। সেটা মাধবীকে বলে যাওয়ার কি প্রয়োজন ? সে কাজ তো গোপনেই করতে পারে। চরিত্রটা ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সমান্তরাল গতিতে চলেছে তার প্রেম। অবশ্য জীবনের শুরু থেকেই এভাবে চলে আসছে। কিন্তু জীবনের সঙ্গী কাউকেই করে নি।

সাবিত্রী অনাদিকে ভালবাসলেও খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। কারণ সাবিত্রী খুবই বুদ্ধিমতী। সাবিত্রীর সব গুণ মাতৃসূত্রে মাধবী পায় নি। সাবিত্রী বুঝতে পারে, অনাদি মাধবীকেও শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়। কিন্তু কিছু বলে না। শুধু মাধবীকে গালি দিয়ে বলে—বসে বসে খাচ্ছিস আর রূপ দেখাচ্ছিস।

মাধবী কোন উত্তর না করলেও বুঝতে পারে অভাবী বাড়ীর মেয়েদের অবস্থা।

পৃথিবীর অনেক খবর অনাদি রাখে। পৃথিবীর অনেক ইতিহাস সে পড়েছে। কত দেশের উত্থান হচ্ছে, কত দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। এর কারণ, এর নির্মূলের উপায় সবই সে জানে। কিন্তু সে আর এগিয়ে যেতে চায় না। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাকী দিনগুলো কাটাতে চায় নারীর ভালবাসায়।

এদিকে অসমর্থ হলেও মানসিক দৃঢ়তা জীবানন্দের আছে। ভাল কাজ করার এখনও ইচ্ছা আছে। সৎকাজে সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সে নিজের জীবনটাও উৎসর্গ করতে চায়।

তিন

—মীনাক্ষী, তোমাকে স্কুল মাষ্টারীতে বেশ মানায়। আমিও চেয়েছিলাম কোন একটা কলেজে পড়াবো। অনেক আশা ছিল। শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাজ পেলাম !

—সব কাজই ভাল।

—বাজে—বাজে—একেবারে বাজে। কোন লাইফ নেই।

কথাগুলো হয় পুরীর একটা হোটেলে। পুরী যাওয়ার আগে মাধবীকে সে বলতে গিয়েছিল।

শুয়ে থাকতে থাকতে মীনাক্ষী বলে ওঠে—তোমার একটা বিয়ে করা উচিত।

—কেন?

—কতদিন আর এভাবে কাটাবে?

—কিন্তু, তোমার?

বেশ একটা নীরবতা সৃষ্টি হয়। অদ্ভুত নীরবতা। অনাদির মনটা, চোখ দুটো চলে যায় তার সেই পরিচিত জায়গায়। মাধবীর পাশে বসে সে আত্মসমালোচনা করতে থাকে। সে মাধবীকে যেন বলতে চায়—মাধবীর মতো সরলপ্রাণা মহিলাই তার এখন প্রয়োজন। সহজেই যারা নিজের সর্বস্ব দিতে পারে, তারা স্বামীকেও বঞ্চিত করতে পারে। আত্মমর্যাদাবোধ যাদের নেই, তাদের উন্নতি হয় না।

হঠাৎ মীনাক্ষী বলে ওঠে—কি চিন্তা করছ, বল তো? বোধ হয় ঠিক জায়গায় আঘাত করেছি?

—ঠিক তা নয়। আঘাতটা ঠিক জায়গায় হয় নি বলেই চিন্তা।

মীনাক্ষী একটু আলগাভাবে বলে—তোমার তো অনেক বান্ধবী আছে, ভবিষ্যতের রাস্তা কি তৈরী হয়ে গেছে?

—না—না। সে রকম কিছু হয় নি। আচ্ছা, মনে কর যদি এইভাবেই জীবনটা কাটানো যায়?

—তা হলে সৃষ্টি, মাতৃত্ব, সমাজ সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে।

গভীরভাবে চিন্তা করে অনাদি—সেটা অবশ্যই ঠিক। আমরাই বা এলাম কিভাবে। সৃষ্টির রাস্তা চিরকালই খোলা আছে।

অনাদি খুব গভীরভাবেই চিন্তা করে, সৃষ্টির রাস্তা কোনদিনই বন্ধ হবে না। হয়তো হবে কোন প্রয়োজনে। কিন্তু তার উন্মাদনা। একের পর এক নারী সঙ্গ করেই চলেছে। বারাসতের হীরেন দত্তরায় এখন কলকাতায় বিবেকানন্দ রোডে থাকে। ঠিক এইভাবেই এগিয়ে

চলেছে। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন। অবিবাহিত। অনাদির বন্ধু কাম দাদা। একজন বড় ইঞ্জিনীয়ার। কলকাতার রাতের অন্ধকারে বিলাতী মদের বোতল আর ভাড়াটিয়া মহিলা। এই তার জীবন। সব সময়েই ওপেন সেক্সের কথা চিন্তা করে। ভগবান রজনীশকে খুবই শ্রদ্ধা করে। আবার জীবনানন্দ দাস, বিষ্ণু দে-র কবিতা পাঠ করে। মাঝে মধ্যে ইংরেজীতে কবিতা লেখে। পৃথিবীতে কোন কাজই খারাপ নয়, এটাই ওর উক্তি। সব কিছুই যখন প্রয়োজনে হয়, তখন সে কাজ খারাপ হতে পারে না। এখনও তার অনুতাপ আসে নি।

কিন্তু অনাদি মনে হয় পৃথিবীর এক জায়গায় পরাজিত। সেই জায়গাটা হল মাধবীর প্রেম।

অনেক সময় দেখা যায় কোন চোর বা খুনী ব্যক্তির হঠাৎ কোন কাজের মাথায় পরিবর্তন এসে যায়।

এই রকম ঘটনা ঘটেছিল একবার। সেলিম ডাকাত ছিল, এলাকার নামকরা ডাকাত। একদিন বড় রাস্তায় বাসে ছিনতাই করছে। একজন মহিলার কাছে কিছুই ছিল না। কিন্তু তার কোলে ছিল তার ছেলে। যখন কোনভাবেই টাকা পাচ্ছে না, আর না থাকলেই বা দেবে কি করে, হঠাৎ ছেলেটিকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বাস থেকে। ছেলেটি একবার চিৎকার করেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সেলিমের তখন নেশা ছিল না। মদ যা খেয়েছিল, সেই নেশার ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার ঐ চিৎকারে সেলিমের সারা দেহ কেঁপে ওঠে। সেলিম শোনে—আল্লাহ···বাঁচাও···বাঁচাও···

বাস থেকে নেমে সেলিম সোজা চলে গিয়েছিল মসজিদে। মৌলবীকে সব কিছুই বলেছিল। মৌলবী তাকে সেইদিন থেকে তার অসৎ পথ পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। সেদিন থেকে সেলিম তার কুপথ ছেড়ে দিয়ে ছোট্ট একটা দোকান করে এবং নিয়মিত মসজিদে যায়।

পুরীর হোটেলে অনাদির অবস্থাও ঠিক সেই রকম। মীনাক্ষী

কিছুটা বুঝতে পারে, অনাদি অন্য তালে বইছে। অনাদি অবশ্য শুনেছিল মীনাক্ষীর ইতিহাস। মানুষের ভালবাসা মীনাক্ষীর প্রতি নেই। মীনাক্ষী ইতিহাসের পাতায় অনেক পুরুষের রাতের সঙ্গী। সুতরাং অনাদির মনে ভবিষ্যত তৈরীর কোন স্বপ্ন নেই। অনাদিকে সব মানুষই অনুরোধ করেছে মাধবীর জন্য। কলঙ্কের রেখা তার গায়ে নেই। অনাদি চিন্তা করে, যার গায়ে কলঙ্কের রেখা নেই তাকে কলঙ্কিত করা ঠিক নয়। তবে অনাদি যাকে কলঙ্কিত করে, তার ইতিহাসও কলঙ্কিত।

গভীর রাতের অন্ধকার সরে যায় অনাদি মীনাক্ষীর গল্পে। ভোরের সূর্য উঁকি মারে আকাশে। মীনাক্ষীর চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে।

অনাদি হঠাৎই যেন শুনতে পায়—"জীবনে কাউকেই তো ভালবাসি নি। আমার প্রথম এবং শেষ ভালবাসাটা তোমাকে। আমি জানি আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই শেষ ভালবাসাটুকু আমি তোমাকেই দিতে চাই।"

মনে হয় মানুষ স্বর্গের স্বপ্নটা নরক থেকেই দেখে। দুঃখে জর্জরিত মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। খেটে খাওয়া মানুষদের হিংসা হয় বড় বড় পাকা বাড়ী দেখে। কিন্তু বড় বড় বাড়ী করতেও হয়তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। গায়ের রক্ত জল করতে হয়। দরিদ্র মানুষ চেষ্টার জোরে বড়লোক হয়। আমাদের সব চাইতে বেশী ক্ষতি করে লোভ এবং হিংসা নামক প্রবৃত্তি দুটো। জীবন সম্পর্কে মানুষের নৈর্ব্যক্তিক ধারণা জন্মানো দরকার। অনেকেই সমাজের ভাল লোকদের নিয়ে নেশার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনেক মানুষ আছে, অনেক ভাল মানুষ আছে, যাদের মধ্যে অনেক অনেক নোংরা জল ঢুকে আছে।

অনাদি মীনাক্ষীকে কলঙ্কিত করতে চায় নি হয়তো। মীনাক্ষী হয়তো নিজের প্রয়োজনে অনাদির সঙ্গ দিয়েছে। এই জায়গায় এদের সমাজদ্রোহী বলার কোন অবকাশ আছে কিনা জানি না। অনাদির

বন্ধু কাম দাদার মতে এ সবই প্রয়োজনে। অনেক সময় দেখা যায়, সমাজের অনেক ভাল কাজ করেও তাকে সমাজ হতে শেষ হয়ে যেতে হয়েছে। জোয়ান অব আর্ক-এর পরিণতি আমাদের জানা আছে। সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং আখ্যা পেতে হয়েছিল।

সুতরাং দত্তরায়বাবুর মতে মদের পৃথিবীটা অনেক ভাল। দত্তরায়কে অনাদি বলে গবেষক। দত্তরায় জানে, কলম্বাসকে শৃঙ্খল পড়তে হয়েছিল এত দেশ আবিষ্কারের পর রাণী ইসাবেলার নির্দেশে। চার্চিলকে মানুষ নির্বাচনে পরাজিত করেছিল। আরামবাগের গান্ধী প্রফুল্ল সেনকে মানুষ পরাজিত করেছিল। সুতরাং মানুষের ঘৃণার মধ্যে বাঁচার চেয়ে ভোগের মধ্যে বাঁচাটাই শ্রেয়।

অনাদি অবশ্য দত্তরায়কে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করতে চায় না। একবার একদল মাতাল রাস্তায় মিছিল বের করে। স্লোগান দিতে থাকে—দুনিয়ার মাতাল এক হও। মদের দাম কমাতে হবে।

এটাও প্রয়োজন। মদ তো অনেক মানুষই খায়। মাতলামি সকলেই করে না। আবার অনেকেই শেষ করে ফেলে তার সর্বস্ব।

অনাদিও এক ধরনের নেশাগ্রস্থ। তবে শেষ হয় নি, শেষ করেছে।

উদাস ভাবে চিন্তা করতে দেখে মীনাক্ষী বলে—তোমাকে কেমন যেন লাগছে। একটু আনন্দে থাকো না।

—শরীরটা খুব ভাল নেই। চল ফিরে যাই।

মীনাক্ষীর মুখটা লাল হয়ে ওঠে—ঠিক আছে।

এদিকে মাধবীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে বুকে। সেই জীর্ণ কাপড় পরিহিতা 'নাবালিকা' প্রত্যহ যায় একই রাস্তায় বাবার এবং ভাই-এর খাবার দিতে। চোখের সামনে সেই জায়গাটা ভেসে ওঠে। কখনো কখনো সে স্বপ্ন দেখে। যেন অনাদি বসেই আছে। কোন সময় আবার একাকী গিয়ে বসে। অনেকের অনেক কথা শোনে। বৃদ্ধার মুচকি হাসি দেখতে পায়। শুনতে পায়, অনাদি মীনাক্ষীর হোটেল বাস। জীর্ণ কাপড়টার দিকে তাকিয়ে শুধু কাঁদে। চারিদিকে তার

জল। চোখে জল, নদীতে জল, পুকুরে জল। মাঝে মধ্যে সূর্য ডুবে যায়। তবুও সে বসে থাকে। বসে থাকে কোন আশায়, অথবা হতাশার পর হতাশার আঘাত খেতে! আবার দেখে ছিঁড়ে যাওয়া কাপড়টি। ভেসে ওঠে দারিদ্র্যের সুখ।

সেদিন অনাদি মাধবীর কাছে তার কিছু কথা বলার জন্যই বসে আছে তাদের সেই নির্দিষ্ট জায়গায়। বাঁশি বাজতেই থাকে। সবাই জেনেছে অনাদি-মীনাক্ষীর ব্যাপারটা। তবে মাধবীর প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করলে সে উচিত শিক্ষা পাবে ক্লাবের ছেলেদের কাছে। কারণ সকলেরই একটা সু-দৃষ্টি আছে ঐ পরিবারটির প্রতি। ক্লাবের ছেলেরা চায়, উভয়ের প্রেমটা একটু পাকুক। তবে দৈহিক মিলন হলেই জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে।

মাধবী চারিদিক তাকিয়ে পাশে গিয়ে বসে। অনাদি তাড়াতাড়ি বলে—এস—এস। বস।

পাশে বসে বলে—এবার তাহলে আমার পালা।

—মানে?

—আরও ভেঙে বলতে হবে? তবে আমার এই ছেঁড়া কাপড় তোমার পাশে মানাবে না।

—তুমি তাহলে সব শুনেছ?

—কলোনীর সকলেই জানে।

—তাই কেউ ভালভাবে কথা বলছে না। আচ্ছা মাধবী, তোমার ঘৃণা হয় না? আমাকে শেষ করে দিতে ইচ্ছে করে না?

—আমাদের কি আর সে ক্ষমতা আছে? আমি তোমাকে ভালবাসি, তাই আসি। তুমি কোথায় কি করছ, সেটা দেখার আমার প্রয়োজন নেই। আর তুমি তো কয়েকদিনের জন্যে এখানে এসেছ।

—মাধবী, সত্যই তোমার কাছে আমি পরাজিত।

—এটা তো তোমার অভিনয়ও হতে পারে।

—হ্যাঁ, তুমি কেনই বা বিশ্বাস করবে! তবে আমি তোমার পবিত্রতা নষ্ট করতে চাই না।

—হাসালে অনাদিদা। আমাদের আবার পবিত্রতা!

—কেন ?

—গরীবের পবিত্রতার কোন মূল্য নেই।

—তোমরা যা শুনেছ সবই সত্য। আমরা পুরীর হোটেলে ছিলাম, এবং একই বেডে।

—ভাল তো। তবে তুমি আজ থেকে আমার সঙ্গে কোন প্রেমের কথা বলবে না।

—কারণ ?

—কারণ আমি কিন্তু মীনাক্ষী নই। আমি গরীব জীবানন্দ মিত্রের মেয়ে।

অনাদির জীবনে যেন রিগ্রেসন শুরু হয়। বহু অন্যায় করে এসে মাধবীর কাছে সারেণ্ডার করে। তবে সে বুঝতে পারে, কেন তাকে মাধবী বিশ্বাস করবে? অনাদি এমন একটা জায়গায় যেতে চায়, যেখানে মাধবীর আর সন্দেহ থাকবে না।

মাধবী বলে—আজকের মতো আসি।

—চলে যাবে ?

—কি করব ?

—আর একটু বস।

—বেলা তো চলে যাচ্ছে। তুমি তোমার কাজ কর। তবে মাঝে মধ্যে কথা বলবে। আমাদের বাড়ীও এস।

—হ্যাঁ, আমি এটা খুবই ভালভাবে জেনে গেছি, এই কলোনীতে যদি কেউ একটু বসতে দেয় তো জীবানন্দদাই দেবে।

—তার জন্য দায়ী কে ?

—আমি, আমি-ই।

শক্তি বহির্গমনের পথ না পেলে মানুষ অসভ্য হয়ে যায়। তাই

মানুষকে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়।

কিন্তু অনাদির কাজ কম। তারপর দত্তরায়কে গুরু বলে মানত। কারণ সে ভাবত, যা কিছু করছি নিজের প্রয়োজনে। মাধবীর কাছে এখন সে ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত।

অনাদি বসে থাকলেও মাধবী চলে আসে। অনাদি আবার বাঁশি ধরে। অনাদির বাঁশির সুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূর চলে যায়। কিন্তু মাধবীর কানে যায় না। কারণ তার বেদনাসিক্ত চিন্তা কান দুটোকে বধির করে দেয়।

বাড়ী ফিরে মায়ের আদেশে টুলুকাকুর কল থেকে জল নিয়ে আসে। মাধবী চুপ করে বাড়ীর উঠোনে বসে। বেড়াতে আসে অর্চনা।

—কি ব্যাপার, চুপ করে বসে যে ?

—শরীর ভাল নেই।

—না অন্য কিছু ?

—কথা হয়েছে, আজ পালিয়ে এসেছি। বুঝতেই তো পারছিস, আমরা গরীব, গরীবদের সঙ্গে কেউ আত্মীয়তা করতে চায় না। তাতে মর্যাদাবোধ নষ্ট হয়।

অর্চনা হেসে ফেলে—আমার কিন্তু ছেলেটাকে ভাল লাগে না। একেবারে চোয়ার।

—না না, চোয়ার বলিস না, ওর যা ভাল লাগছে করছে।

—তোর কি রাগ হচ্ছে ?

—রাগ কেন হবে। ও আমার কে !

—না, যে ভাবে কথা বলছিস।

—অন্যভাবে নিস্ না। ওতো একটা মানুষ, আর মানুষের দোষ-গুণ তো থাকবেই। তবে আমাদের কপালের দোষ।

অর্চনা মাধবীর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারে।

একটা অবলম্বন সে হয়তো পেয়েছিল। কিন্তু···

অর্চনা অনেক কথাই চিন্তা করে। মাধবীর জীবনে সকাল থেকে সেই একই কাজ। সেই চাল-লবণ কিনে আনা, সেই রাস্তা, আবার

ফেরা। সেই সকাল। সেই সূর্য। সেই দুঃখ। সেই এক অনুপ্রাস। মাঝখানে অনাদির আবির্ভাব।

বেলা প্রায় দুটো। কলোনীর প্রায় সকলের খাওয়ার পর্ব চুকে গেছে। হেমন্ত কাল। মাধবী তার বাবার দোকানেই বসে আছে। মনে শান্তি নেই। কানাই একবার বলে ওঠে—যা না, বাড়ী যা।

মাধবী বিরক্ত হয়ে বলে—যাচ্ছি রে যাচ্ছি।

জীবানন্দ বুঝতে পারে—মায়ের সঙ্গে বোধ হয় ঝগড়া করেছিস। ঝগড়া করিস না, বাড়ী যা।

একজন ভদ্রলোক সাইকেল মেরামতির জন্য আসে। জিজ্ঞাসা করে—এটা কি মেয়ে?

—হ্যাঁ, আমার মেয়ে।

—কি নাম?

—মাধবীলতা মিত্র।

ভদ্রলোক জীবানন্দের হিতাকাঙ্খী। বলল—বিয়ের তো ব্যবস্থা করতে হয়।

—কি করে করব? দেখতে তো পাচ্ছেন কি ভাবে দিন চালাচ্ছি।

—তোমার তো অনেক পরিচিত লোক আছে। যা হয় চেয়ে-টেয়ে ব্যবস্থা করবে।

—দেখা যাক।

লোকটির কথা মাধবীর মোটেই ভাল লাগছিল না। জীবানন্দ কাজে মন দেয়। পথে মাধবীর মনে নানা ধরনের চিন্তার উদয় হয়। স্বচ্ছ নদীর জল ক্ষীণ গতিতে এগিয়ে চলে যায়। নদীর উপর সারিবদ্ধ গাছগুলো ঝিরি ঝিরি হাওয়ায় দোল খেতে থাকে।

বাড়ী ফিরে মাধবী দেখে বাড়ীতে কেউ নেই। পাড়া চুপচাপ। মাধবী প্রথমে হতভম্ব হয়ে যায়। তারপর বাড়ীর বাইরে এসে দেখে দু-একজন ছুটে যাচ্ছে। বিষয়টি আর তার অজানা থাকে না। মাধবীর চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। দু-এক ফোঁটা জলও গড়িয়ে পড়ে। ছুটে চলে আসে।

দেখে দুটি বাড়ীতে লোকজন ছুটফট করছে। দুই বাড়ীর দুটি মেয়ে বিষ খেয়েছে। দুই বান্ধবী। নিস্তেজ হয়ে গেলে ডাক্তার এসে জবাব দিয়ে যায়। থাকতে থাকতে কান্না শুরু হয়ে যায়। কলোনীর লোকগুলো বড্ড তৎপর। ক্লাবের ছেলেরা এই সব ব্যাপারে খুবই ভাল। তাড়াতাড়ি কাঠ, কয়লা যোগাড় করে নদীতে দাহ করে ফেলে। যাতে করে পুলিশ টের না পায়।

দুই বান্ধবী পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। বয়স ২০—২২ বছর হবে। কিন্তু কেন গেল সেটা কেউ জানে না। শিবানী এবং সরস্বতীর এই ভাবে মৃত্যুতে পাড়ার মধ্যে বেশ সাড়া পড়ে যায়। সরস্বতীর সঙ্গে অনাদির সবে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাতে তো মৃত্যুর কোন কারণ নেই। আত্মহত্যা মানুষ করে অনেক দুঃখে। তবে নিশ্চয়ই কোন একটা ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেছিল যাতে তারা আত্মহত্যা করল। বিরাট কাণ্ড ঘটে গেল।

মাধবী এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। দুটি পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। নানা জন নানান মন্তব্য প্রকাশ করে মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করতে লাগল। তবে বেশীর ভাগ মানুষের ধারণা—ব্যর্থ প্রেম। কিন্তু কার সঙ্গে প্রেম করত, কোথায় প্রেম করত, কেউ জানে না।

টুলু চ্যাটার্জী শুধু বলে—আমার মনে হয় এই মৃত্যুর কারণ হতাশা। বাবারা বিয়ে দিতে পারবে না ভেবে বাবার বোঝা কমানোর জন্যই তারা চলে গেল।

সকলের কাছে অবশ্য এটা গ্রহণযোগ্য হয় না।

অপবাদ দেওয়াটা মানুষের স্বভাব। ভারতবর্ষের মানুষের এই গুণটা জন্মগত! সুতরাং, মৃত্যুর পর দুইজনে দারুণ ভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়। অদৃশ্য আত্মা যেন সমালোচনার ভয়ে কলোনী ছেড়ে পালিয়ে যায়!

প্রায় দশ দিন পেরিয়ে যায়। শিবানীর মা শিবানীর ঘরটি পরিষ্কার করতে করতে একটি চিঠি পেয়ে যায়—

"আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। কলোনীর মেয়েরা সাধারণত আত্মহত্যা করে না। তারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ইজ্জতও বিকিয়ে দিয়েছে, তাদের সংগ্রাম সার্থক হবেই। পরিশ্রমের মূল্য মানুষ পায়, শুধু আমরা দুজনে চলে গেলাম অন্য একটা কারণে। সে কারণ আমাদের ব্যক্তিগত, প্রকাশ করা যাবে না। তবে কাউকেই এই ব্যাপারে দায়ী করো না। মা বাবার সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু···

প্রণাম নিও।

ইতি—

শিবানী

রতিকান্ত চশমাটা খুলে চোখ মুছে বলল—ভুল করলে।

শিবানীর মা এক কাপ চা এনে দিয়ে বলল—নাও। কিছু বুঝতে পারলে ?

—খুবই জটিল।

—কেন এমন হল !

রতিকান্তবাবু এবং তার স্ত্রী পার্বতী অর্থাৎ শিবানীর মা বাবা বিষয়টি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

তবে সরস্বতীদের অবস্থা খুবই খারাপ। সরস্বতীর বাবা গ্রাম থেকে টলিতে করে ধান কিনে এনে সিদ্ধ করে চাল তৈরী করে, তারপর বাজারে সেই চাল বিক্রি করে সংসার চালায়। রতিকান্তবাবু অবশ্য একটু টনটনে।

রতিকান্তবাবু চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে সরিয়ে রাখে। চোখের জল মুছে আপন মনেই বলতে থাকে অ্যালফ্রেড অ্যাডলারের উক্তি—

"···Inferiority is the basis for human sterving and success on the other hand. The sense of inferioriy is the basis for all other problems of psychological

maladjustment. When the individual does not find a proper concerete goal of superiority, an inferiority complex results."

আকাশের দিকে তাকিয়ে রতিকান্তবাবু বলে—পলায়নী মনোবৃত্তি কেন···আমি তো বেঁচে আছি···

রতিকান্তবাবু আত্মহত্যার চরম বিরোধী। বিভিন্ন মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের বই তিনি পড়েছেন। এই মরণশীল পৃথিবীতে সংগ্রাম করে বাঁচাটাই শ্রেয়। কারণ মৃত্যু তো আসবেই, তার জন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি।

কান্নার শব্দ আসে সরস্বতীদের বাড়ী থেকে। বোধহয় কোন নতুন লোকের আগমন হয়েছে।

চার

—তুমি তো আমার সব কিছুই জান। আমার ফেলে আসা জীবন, বর্তমান জীবন। তবু কেন এত ভালবাস ?

—অত বুঝিয়ে বলতে পারব না। কারণ আমার পড়াশোনা তো বেশীদূর নয়। আর একই কথা বারবার বল কেন ?

—তুমি তো বলেছ প্রেমের কোন কথা না বলতে। তাহলে কি কবিতা শুনবে ? আমার ফেলে আসা রাজনৈতিক জীবন শুনবে ?

—কবিতা শুনব না। তবে রাজনৈতিক জীবনের কিছু বলতে পারো।

—হ্যাঁ, তার আগে ঐ মেয়ে ডুটোর কি হয়েছিল, তুমি কিছু জান কি ?

—যদিও কিছু জানি না। তবে আমার মনে হয় ব্যর্থ প্রেম।

—Psychology তাই বলে। কি প্রয়োজন ছিল ? বেঁচে থাক্‌, পৃথিবীটা দেখ্‌। মৃত্যু তো আসবেই, কিন্তু পৃথিবীটা আর দেখতে পাবি না।

—কি করা যায় ?

ছেঁড়া কাপড়টার দিকে অনাদির দৃষ্টি চলে যায়। অনাদি কোনদিন মাধবীর গায়ে হাত দেয় নি। নির্দিষ্ট জায়গায় বসেই বলে—একটা কথা বলব ?

—বল।

—তোমাকে আমি একটা কাপড় কিনে দিতে চাই।

—বাপ্‌রে। বাবা শেষ করে দেবে। আর তুমি কেন্ই বা আমাকে কাপড় কিনে দেবে, গরীব বলে ?

—না-না, তোমাকে আমি খুবই কাছে টানতে চাইছি না। তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইছি না।

—তাহলে ?

—তোমাদের সততার মূল্য দিতে চাইছি।

—কি হবে ? আমাদের মূল্য শূন্য—সাহারা…

মাধবী উঠে দাঁড়ায়—আর বেশীক্ষণ বসব না! আজ আমাকে দেখতে আসবে। স্নান করেই চলে যাব। অর্চনার কাছ থেকে শাড়ী আনতে হবে।

—কোথা থেকে লোক আসছে ?

—রামনগর থেকে।

— ঘটি ?

—হ্যাঁ। তবে যেভাবে পণ চাইবে, বিয়ে হবে না।

অনাদির বাঁশি শুনতে শুনতে মাধবী চলে আসে। জীবানন্দ বহু কষ্টে ভদ্রলোকদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

অনাদি বসেই থাকে। হঠাৎ তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—এত সরল !

…এতদিন চাকরী করলাম, রাজনীতি করলাম, কিছুই করতে পারলাম না। বয়সও হয়ে আসছে। বাঁশি বাজিয়ে মনে করেছিলাম বিখ্যাত হব। কিন্তু…

আবার মনে হয়—ডেনিশ কবি হোলবার্গের সাফল্য এসেছিল ৪০

বছরের পর। হল্যাণ্ডের কবি ভণ্ডেল খ্যাতি পান ৫০ বছর পরে, ইংরেজ কবি জর্জ ক্র্যাব 'টেলস অব দি হল' লেয়েন ৬০ বছর বয়সে, মিলটন 'প্যারাডাইস লষ্ট' লেখেন ৫৭ বছর বয়সে, গেটে 'ফাউস্টের' প্রথম পর্ব লেখেন ৫৮ বছর বয়সে, দ্বিতীয় পর্ব ৮২-তে, ডাঃ স্যামুয়েল জনসন তাঁর শ্রেষ্ঠ বই 'Lives of the Poets' লিখেছিলেন ৭৫ বছর বয়সে, জন ড্রাইডেন খ্যাতি অর্জন করেন ৬০ বছর বয়সে। আবার সুরকার হ্যালডেনের প্রতিভা বিকশিত হয় ৬০ বছর বয়সে। ...আমার বাঁশি কি কেউ পঞ্চাশ বছরে শুনবে না? কেন আমি পারি না নতুন উদ্যমে সংসার করতে। ...তবে জীবানন্দ আমার চেয়ে ভাল ছেলে পেতে পারে। হ্যাঁ, আমি চাই মাধবী সুখী হোক।

মানুষের জীবনের লক্ষ্য বহুমুখী। কেউ শিল্পী হতে চায়। কেউ কবি। কেউ সুখে সংসার তৈরী করতে চায়। মেয়েদের ভালবাসা, গাড়ী...বাড়ী...

শেলীর কথায়—

"We look before and after
and pine for what is not."

অনাদি কি আজ যা চাইছে, তা কি ভুল করে? আর যা চাচ্ছে, তা কি পাবে?

জীবানন্দের বাড়ীতে মানুষেরা আসে। মেয়ে পছন্দ করে। ছেলের স্বাস্থ্য বেশ ভাল। চাষ করে। কয়েক বিঘা জমি আছে। কিন্তু দারুণ দাবী। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দিলেই বিয়ে হয়ে যাবে। কিন্তু জীবানন্দের পঁয়ত্রিশ টাকাও নেই। সংসার জীবনে এর চাইতে আর বড় ট্র্যাজেডী আর কি হতে পারে? যার রূপ, যৌবন, সরলতা, সততা সবই আছে, শুধু পয়সার জন্য তার সারাটা জীবন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে?

অনাদি অবশ্য সব খবরই পায়। তার মনের মধ্যে একটা ঝড় ওঠে। সে মাধবীকে একবার বলতে চায়। সে বলতে চায়—আমাকে মানুষ কর। আমাকে বাঁচার জন্য ইন্ধন দাও।

শতছিন্ন জীবনের বাকী অংশগুলোকে একত্রিত করে অনাদি শুধু মানুষ হতে চায়।

স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পগুলো মানুষের সামনে হাজির করার জন্য এলাকায় এলাকায় নাটকের আয়োজন করে। অনাদি এবারের আয়োজনটা করে তার কলোনীতে। কলোনীর সকলকেই জানিয়ে দেয়। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যে টাকাটা দেয় সেটা নিয়ে ক্লাবের ছেলেরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ঘণ্টাখানেক বক্তৃতার পর নাটক পরিবেশিত হবে। নাম 'সুসময়'।

সন্ধ্যার মধ্যে গাড়ী এসে উপস্থিত হয়। ব্যবস্থাপক অনাদি। সেও একটা ভূমিকা নেবে। এইবার প্রথম আসরে বাঁশি বাজাবে। তার চোখ দুটো অসংখ্য মানুষের মধ্যে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ দুটো চোখ তার উপর পড়ে। অনাদি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়।

শুরু হয় ডাঃ আনোয়ারের বক্তৃতা।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার হার বাড়ছে। বংশবৃদ্ধির হার প্রায় ৪৫%। লোকসংখ্যা ৮৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এর জন্য সরকার নানা ধরনের কৌশল আবিষ্কার করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ-এর ট্যাবলেট, কপার-টি লাইগেশন, ভ্যাসাকটমি সবই বেরিয়েছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

পরিকল্পিত পরিবার প্রয়োজন! জানেন এই পরিকল্পিত পরিবার আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাংগার। তিনি ১৯৩৫ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। জানেন তিনি রবীন্দ্রনাথকে একবার লিখেছিলেন—

The Indian papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Santiniketan. Perhaps you have seen his recent statement

in opposition to Birth Control. You have Travelled all over the Earth, and you have observed the joys and sorrow and miseries of the world, and we take it for granted that with your international out-look on life and human society you cannot but feel friendly towards Birth Control."

পাশ থেকে চিৎকার ওঠে—মশাই বাংলায় বলুন! বাংলায় বলুন।

ডাক্তারবাবু তখন আবেগে বলে চলেন—জানেন রবীন্দ্রনাথ কি বলেছিলেন—

…"I am of opinion that Birth Control movement is a great movement, not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause peace by lessening the burden of surplus population of a country scrambling food and space outside its own rightful limits. In a hunger striken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence that could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family……"

জোরে চিৎকার শুরু হয়ে যায়। ডাক্তারবাবু বাধ্য হন বক্তৃতা বন্ধ করতে। ততক্ষণে বাজতে শুরু করে অনাদির আড় বাঁশি, রবীন্দ্র-সংগীতের সুর।

কে যেন বলে ওঠে—এই তো সব নষ্ট করে দিচ্ছে। চারিদিকে সৃষ্টি করে যাচ্ছে আর মুখে Birth Control. ব্যাটা সৃষ্টির রাস্তা বন্ধ করবে কি মস্থণ করছে।

হাসির রোল পড়ে যায়। তবুও বেজে চলে—"তুমি যে ছেয়ে আছ

আকাশ জুড়ে…”

রতিকান্তবাবু বলে ওঠে—ছেলেটার প্রতিভা আছে। যে যা বলুক, আমার মতে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

একজন বলে ওঠে—ওর সম্পর্কে কতটুকু জানেন ?

—সে জানার আমার প্রয়োজন নেই। আমি যেটা দেখলাম, তাতে সে এত ভাল বাজাতে পারে আমি জানতাম না।

—কিন্তু, One who has no character, he is nothing.

প্রতিভা বা চরিত্র মনে হয় সমান তালে সব সময় চলে না। চরম অপ্রাপ্তির বেদনা থেকেই মনে সাফল্য বেশী আসে। অনাদির মধ্যে যে প্রতিভা আছে তাতে সে ভবিষ্যত তৈরী করতেও পারে।

আস্তে আস্তে আলোগুলো নিভে আসে। বাঁশির সুরও থেমে যায়। মাইকে একজন বলে ওঠে—এবার আমাদের নাটক শুরু হচ্ছে। আজকের নাটক ‘সুসময়’। কাহিনী ধনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

নাটক শুরু হয়ে যায়। মাধবী বাড়ী ফিরতে থাকে। কারণ সে নাটক শুনতে যায় নি। গিয়েছিল অনাদির বাঁশি শুনতে। অনাদির চোখ দুটো সব সময়েই মাধবীর দিকে। সেও পিছন ধরে। ছোট্ট একটা গলিতে এসে সামনে দাঁড়ায় অনাদি—কেমন লাগল ?

—কে অনাদিদা! চমৎকার।

—পালিয়ে যাচ্ছ ?

—না, নাটক আমার ভাল লাগে না।

—বল কি! নাটকের মত জিনিস আছে! জান, কলকাতায় নাটকের হলগুলো সব সময়ই ভর্তি থাকে।

—আমার কলকাতার পার্টিদের যাত্রা খুবই ভাল লাগে।

—ঠিক আছে। যার যা পছন্দ।

—তবে তোমার বাঁশির ঝাঁঝ ছিল প্রবল।

—কি রকম ?

—অনেকেই পাগল হয়ে গেছে।

অনাদি মৃদু হাসে। পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুখটা

মুছে বলে—ঠিক আছে, আবার কালকে দেখা হবে

এক কোণে জড়ো হয়ে থাকা ছেঁড়া সপ এবং বালিশটা পেতে মাধবী শুয়ে পড়ে। কথায় বলে—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা। মাধবীর অবস্থাটা ঠিক সেই রকম। তবে স্বপ্ন দেখায় দোষ কি? অনেকে তো লটারীর টিকিট কাটে। অনেকেই নিরাশ হয় না। তেমনি স্বপ্নও অনেক সময় সত্য হয়। তাই মাধবীর স্বপ্নও সত্য হতে পারে।

ভগবান বুদ্ধদেবের মার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছিল। স্বপ্ন অনেকটা বাঘের আগে ফেও-এর মতো। মানুষের আগে ছায়ার মতো। অনেক সময় আবার মিথ্যা।

অনেকের প্রশ্ন—মাধবী কেন অনাদির পিছনে ছুটছে? মাধবী সব কিছু জেনেও ভুল করছে কেন? গরীবের একবার সর্বনাশ হলে, আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মীনাক্ষী বড়লোকের মেয়ে। চাকুরে। তার কথা আলাদা। কিন্তু মাধবী?

অনেকের আবার ধারণা—অনাদি এবং মাধবীর আলোচনার মধ্যে কোন প্রেম নেই। এমনি যেমন বন্ধুদের মধ্যে কথা হয় ঠিক তাই। কেউ কেউ চিন্তা করে—যদি মেয়েটা উদ্ধার হয়ে যায় তো যাক। কারণ জীবানন্দের যা কষ্ট। কোন দিন খেতে পায়, কোন দিন পায় না। কি কষ্টটাই না করে!

জীবানন্দকে অনাদিও অনেক দিন দেখেছে তার ফিল্ডে তিলের খাজা বিক্রি করতে। খুবই কষ্ট পেত অনাদি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার চালায়। সর্বত্রই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কারণ সে তো অসৎ নয়। মিথ্যাবাদীও নয়। কোন খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্তও নয়।

অনেকে বলে—মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা কর। দেখাশোনা করছো কি?

জীবানন্দ কথাগুলো গভীর ভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু উত্তর দেওয়ার সময় বলে—কি করব, কপালে কি আছে কে জানে! মেয়ের ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আমি তার কি করব? কোথায় পয়সা পাব?

অনেকের মুখ থেকে এ কথাও শোনে—'বদলা-বদলি' কর। অর্থাৎ তোমার মেয়ের সঙ্গে অমুকের ছেলের এবং অমুকের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে দাও।

এ রকম বিয়েতে সাবিত্রীর মন ওঠে না। সাবিত্রী বলে—এভাবে যতগুলো বিয়ে হয়েছে, তার ভবিষ্যতে ফল খারাপ হয়েছে। মেয়ে বাড়ীতে থাক তাও ভালো।

সব মিলিয়ে একটা সীমাহীন দারিদ্রের ছবি। অনেক দিনের পুরনো পাউডারের কৌটো থেকে পাউডার বের করে মাধবী মাখছে। আয়নার সামনে তার মুখটা। মুখের উপর একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য। পাউডারের প্রয়োজন নেই। তবুও অনাদির পাশে বসার জন্য একটু তৈরী হয়। হঠাৎ তার মুখটার প্রতি ঘৃণা আসে। আয়নাটা ধপ্ করে ফেলে দেয়। যাক, আয়নাটা ভেঙ্গে যায় নি।

ঘৃণাটা কেন হলো ঠিক বোঝা না গেলেও, মনে তার ঘৃণা নারী মুখটার প্রতি। যদি পুরুষ হতো, সাইকেল নিয়ে কিছু মালপত্র বা কাঁচা তরকারী বিক্রি করলে কিছু রোজগার করতে পারত। এই মুখটা সব কিছুতেই বাধা সৃষ্টি করেছে।

অপ্রকাশিত বেদনায় মুখটা লাল হয়ে যায় মাধবীর।

কিন্তু সকলেই যদি পুরুষ হবে, সকলেই যদি বড়লোক হবে, তাহলে অভিধান আবার নতুন করে লিখতে হবে। সব কিছুই প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে। আগ্রহ, পরিশ্রম এগুলো মানুষের মনের এক একটা অঙ্গ। মানুষকে এরা বাঁচিয়ে রাখে। আশা হলো মনের ফসল। মন আশার জন্ম দেয়। মন যদি কুঁড়ে হয়ে যায়, যদি দুর্বল হয়ে যায়, মানুষ পরিশ্রমে বিমুখ হয়ে পড়ে। সংসার অসাড় হয়ে যায়।

আবার অনেককে অত্যধিক পরিশ্রম করতে হয়। যেমন জীবানন্দকে। সেই তুলনায় তার খাবার কম। সকালে গুনে দু পিস্

আটার রুটি। তারপর বারোটা-একটার সময় ভাত। আবার সেই রাত্রিবেলা খাওয়া।

সাবিত্রী এক সময় মনস্থির করেছিল গ্রাম থেকে ধান কিনে এনে সিদ্ধ করে চাল তৈরী করে বাজারে বিক্রি করবে। পাড়ার অনেকেই করে, কিন্তু কানাই জোর বাধা দিয়েছিল। একাজে তার মন নেই।

সাবিত্রীর কথা ছিল—সপ্তাহে একদিন পনের-কুড়ি কুইণ্টল ধান কিনে এনে দিলে আমরা মা-মেয়েতে বসে বসে সিদ্ধ করব।

কিন্তু পনের-কুড়ি কুইণ্টল ধানের দাম কত? এত টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?

সাবিত্রী কানাইকে বলেছিল—তোর বাবাকে তো অনেকেই চেনে, বললে ধারে দিতে পারে। আমরা তো শোধ করে দেব।

জীবানন্দও রাজী হয় নি। কারণ ধারের ব্যাপারে সে কিছুটা দূরে থাকতে চায়। একে তো বসাককে সব সময় টাকা দিতে পারে না, তারপর গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

বাধ্য হয়ে সাবিত্রী সরে এসেছিল। বসে বসে খাওয়ার পক্ষপাতী সে নয়। সেও কিছু একটা করতে চায়। কিন্তু জীবানন্দের শাসন। প্রেস্টিজ।

দুঃখের সংসারে মাধবীরা হতাশ নয়।

মাধবীর সঙ্গে অনাদির আর দেখা হয় নি। রাস্তায় উভয়ের মধ্যে কথা হয়েছিল। দেখা হবে বলা সত্ত্বেও দেখা হয় নি। কারণ অনাদি একটু ব্যস্ততার মধ্যে ছিল। অফিসে বহু কাজ জমেছিল। দ্বিতীয়ত তার বদলির ব্যাপারেও সে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। তবে কাউকেই তেমনভাবে কিছু বলে নি।

মাধবী অবশ্য যথারীতি বাবা এবং ভাই-এর ভাত নিয়ে যায়। পরিচিত জায়গাটা দেখে। মাঝে মধ্যে দেখা হয় বুড়োমার সঙ্গে। মুচকি হাসে। কখনও আবার বলেই ফেলে—খুব মজাইতেছিস। দেখিস, ছেলেটা কিন্তু ভাল না রে।

মাধবী হাসে। কখনও বলে—তোমারও দিন ছিল।

—ছিল।

—এখন মনে পড়ে না?

—পড়েছিল। যেদিন দেখতেছিলাম তোদের।

মাধবী ভাবে—বুড়োমার কথাটা মনে আছে। বেশী কথা না বাড়িয়ে সে চলে যায়।

মাধবী একটা দূরত্ব অনুভব করে। হয়তো তার কোন ক্রটি হয়েছে। আবার মনে মনে ভাবে—অনাদিদা কেন তার সঙ্গে গল্প করবে! কি লাভ!

নানা চিন্তা নানা দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে মাধবীর সময় কাটতে থাকে। ঠিক বুঝতে পারে না। আর বোঝানোও সম্ভব নয় যে তার সুসময় আসছে না দুঃসময় আসছে। তবে সে ইচ্ছা করেই 'সুসময়' নাটকটি দেখে নি। যার বিষয় এক নব জাতকের জন্ম। সৃষ্টির শেষ নয়। ধৈর্যে সৃষ্টি! মাধবী যে কেন নাটকটি দেখল না সেটা অনাদি বুঝতে পারে নি। তবে নাটকের নামটা মাধবীর ভালো লাগে। কারণ বারবার সে তার বাবাকে বলে। কিন্তু বিষয়টি বলতে পারে না। তার বাবাও নানা রকম ধারণা করে নেয়। বিশেষ করে রাজনৈতিক ধারণা। সঠিক উত্তর পায় না মাধবী। তার মধ্যে আগ্রহ রয়ে যায়।

॥ পাঁচ ॥

প্রিয় মাধবী,

ভেবেছিলাম এই জীবনটা একটু ভালভাবে চালাবো। কিন্তু একটা অশুভ শক্তি আমাকে বারে বারে অন্ধকারের দিকে নিয়ে গেছে। জানি, তুমি হয়তো আমাকে বিশ্বাস করো না। তবে ভালবাসো। অর্থাৎ তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি তোমাকে চিরসঙ্গিনী করব না। হয়তো আমার কিছু গুণ আছে, যার জন্যে তুমি আমাকে ভালবাসো। আমি

ট্রান্সফার হয়ে চলে এসেছি বারাসতে। হয়তো এইখানেই থাকতে হবে। তুমি ভাল থাকবে। খুব শিঘ্রই তোমার সঙ্গে দেখা করব।

ইতি—

হতভাগ্য

অনাদিদা

চিঠিটা লেখার পর অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। কিভাবে চিঠিটা পৌঁছান যায়। ডাক মারফত যদি যায়, অন্য কেউ দেখে ফেললে বিষয়টা অন্য রকম হয়ে যাবে। আসার সময় সে মীনাক্ষীকে কিছু বলে আসে নি। মীনাক্ষীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। কারণ সে জানতে পেরেছিল মীনাক্ষী বীরেন দত্তের সঙ্গে জঘন্য কাজে লিপ্ত। তারও চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। তাই অনাদির আত্ম-সমালোচনার সব চাইতে বড় বিষয় ছিল তার সঙ্গে যারা রাত্রিবাস করেছে তারা সকলেই দু নম্বর, তিন নম্বর, এমন কি চার নম্বরও। এদের মধ্যে মীনাক্ষী বোধ হয় চার নম্বর। তার classic work-গুলো সবই ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী কিছু করার মহান লক্ষ্যে সে চিঠিটা পোষ্ট করল।

সেদিন ট্রান্সফার লেটারটা নিয়ে গিয়েছিল জীবানন্দের কাছে। অবশ্য তার বদলির কথা সে বলে নি। সে আলোচনা করছিল তাদের ফেলে আসা রাজনৈতিক জীবন নিয়ে। দুজনেই কমিউনিষ্ট ছিল। এখন চুপচাপ। তবে অনাদি ছিল সম্পূর্ণ অ্যাকশনবাদী, আর জীবানন্দ সংগ্রামী, প্রগতিশীল। এখন হাতুড়ীর দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলে। এখন চিন্তা করে—মূল্যায়ণ কি হবে না?

—জানেন জীবানন্দদা, বিশ্বভারতীতে যখন সি আর পি এসে আমাদেরকে ঘিরল, তখন একমাত্র আমি ছাড়া আর সকলেই ধরা পড়ে যায়।

—আচ্ছা, তোমরা এত সব ভাল অর্থাৎ স্কলাররা এমন খুনের রাজনীতিতে গেলে কেন?

—আমাদের মতো তরুণদের মধ্যে এমনভাবে বিষ ছড়ানো হয়েছিল, যাতে সুযোগটা তৃতীয় পক্ষ নিয়ে নেয়।

—পরিকল্পনার অভাব ছিল।

—অবশ্যই। আমরা মনে করেছিলাম কিছু দুষ্ট লোককে অর্থাৎ সমাজদ্রোহীকে শেষ করে দিলে সমাজ ভাল হবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো।

—আমার মনে হয় খুনের রাজনীতি যারা করছে তারা ভুল করছে।

—তাহলে আপনি কি বলতে চান গান্ধীজীই ঠিক?

—আমার তো মনে হয় গান্ধীজী ভারতবর্ষকে খুব ভালভাবে চিনেছিলেন।

—ক্ষমতায় আসার পর সব পার্টিই তো গান্ধীবাদী হয়ে যাচ্ছে।

জীবানন্দ অনাদি সম্পর্কে খুব বেশী জানে না। অনাদি রাজনীতির কথা বাদ দিয়ে একটু সংসারের দিকে ঝোঁকে।

—আচ্ছা জীবানন্দদা আপনার সংসার এই অল্প আয়ে চলে?

—কোন রকমে চালাতে হয়।

—আপনি কোন প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করবেন?

আগ্রহ ভরা চোখ দুটো অনাদির ওপর পড়ে—চাকরী তো করতাম। আমার আর ইচ্ছা নেই, তবে সম্ভব হলে এই ছেলেটার জন্য কিছু করতে পার।

—আমার মামা একটা বড় কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আশা করি কিছু একটা করে দিতে পারবে।

—তাহলে তো এই গরীবের দারুণ উপকার হয়।

—জানো জীবানন্দদা, সৎ লোকের কষ্ট চিরকাল থাকে না। তাদের জন্য মানুষের সহানুভূতি সব সময়েই আছে।

—কোথায়? তবে তুমি যে বললে খুব ভাল লাগলো।

কানাই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কারণ কানাই অনাদিকে খুব ভালভাবে জানে। সে তাই কথাগুলো একেবারে সহ্য করতে পারছিল না। বার বার চোখে মুখে বিরক্তি ভাব দেখায়। কিন্তু সম্মানী লোক, কিছু বলতে পারে না।

অনাদি বলে—আমি বারাসত যাচ্ছি। ওখান থেকে মামার সঙ্গে

কথা বলে জানাব।

—বারাসত কেন? জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করে।

—না, এমনি যাব।

—আসবে কবে?

—দেখি।

জীবানন্দের একটু সন্দেহ হয়। হয়তো সে ট্রান্সফার হয়েছে অথবা অন্য কোন ব্যাপার। জীবানন্দ খুঁচিয়ে কথা বের করার লোক নয়। তাই সে যতটুকু বলেছে ততটুকুই শুনেছিল।

অনাদি চলে যাওয়ার পর জীবানন্দ কানাইকে বলে—কি বুঝলি?

—তুমি জান না, ও একটা শয়তান। ওর মতো অসভ্য লোক কম আছে।

—কিন্তু কিছু করে দেওয়ার মতো তো ক্ষমতা থাকতে পারে। তারপর মোটামুটি একটা ভাল চাকরীও করে।

—হ্যাঁ, সেটা ঠিক। তবে ওকে আমাদের কলোনীর সকলেই ঘৃণা করে।

—কি? কি বলছিস? সেদিন রতিকান্তবাবু বলছিল—দারুণ প্রতিভাধর ছেলে।

—হ্যাঁ, বাঁশিটা ভাল বাজায়।

—যাক, কিছু একটা গুণ আছে। ও যখন একজন শিল্পী তখন মনটা ভাল হবে। আর ওর এমন কি প্রয়োজন আমার কাছে এসে এত সব কথা বলার?

কানাই চুপ করে যায়। জীবানন্দ গভীর ভাবে চিন্তা করে। তার চিন্তার মধ্যে অনাদিকে সে আত্মীয় সাজিয়ে নিয়ে আসে। যেন সে অনেক অনেক কাছের মানুষ। যেন সে তার সব দুঃখ লাঘব করে দেবে। সে আত্মীয়েরও আত্মীয়।

অনাদি তার মামার সঙ্গে কথা বলে। একটা কিছু করতে পারবে এ ধরনের একটা অফার সে পায়। কিন্তু সঠিক ভাবে কিছু জানতে না

পারায় কোন চিঠি পত্র দেয় না।

মাধবীর চিঠিটা অবশ্য মাধবীর কাছে পৌঁছায়। মাধবী চিঠিটা পড়ার মতো উপযুক্ত জায়গা খোঁজে। অবশেষে ঠিক করে আগের সেই ঠেকে গিয়েই পড়বে।

অনাদি যখন চলে যাচ্ছিল মাধবী তাকে পুকুর ঘাট থেকে দেখেছিল। অনেক ভোরেই সে চলে গিয়েছিল। সেকথা কাউকে বলে নি। তার কেনা চৌকিটা শ্রীদামকে দিয়ে বলেছিল—তোকে এটা আমি এমনি দিলাম। তবে আমি চলে যাচ্ছি কাউকে বলিস না। শংকর বহুরূপীকে একশ টাকা দিয়ে বলেছিল—শংকরদা, তোমার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ। আমি চলে যাচ্ছি। কারণ এ কলোনীর মানুষ আমাকে ভালবাসে না।

সে মাধবীকেও একটা কাপড় কিনে দিতে চেয়েছিল। চেয়েছিল মাধবীর বিবাহে কিছু অর্থ সাহায্য করতে। কিন্তু তার ভাগ্যে যে কি আছে কেউ জানে না। যাওয়ার সময় ঝাপসা আলোর মধ্যে মাধবীদের বাড়ীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তার যাওয়ার খবর মাধবীরা শংকরদার কাছেই পেয়েছিল। কারণ সে শংকর বহুরূপীর কাছে জীবানন্দ মিত্রের সংসারের দুঃখের কাহিনী শুনতো।

শংকর জীবানন্দকে বলছিল—সে তোমাদের খুবই ভালবাসে। তোমাদের সংসারের উন্নতি চায়।

সাবিত্রী বলেছিল—যে যা বলছে বলুক। আমি কিন্তু অনাদিকে ভালবাসি।

শংকর বলেছিল—মানুষের গুণ-দোষ তো থাকবেই।

জীবানন্দ সব কথা শুনে গিয়েছিল। কানাইও বলল, তাকে চাকরীর অফার দিয়েছে। যখন তার কথা এবং কাজ ঠিক হবে সেই সময় কলোনীতে ঢোল পিটিয়ে বলবে।

মাধবীর হৃদয়াশ্রু সারা দেহ সিক্ত করেছিল। ভোরের আশায় সারা রাত জেগে ছিল সে। দূর থেকেই দেখেছিল অনিল-এর মাথায় অনাদির বেডিং আর হাতে তার ব্যাগ। নিঃশব্দে কলোনীকে বিদায়

জানিয়ে অনাদি চলেছে তার সেই পরিচিত রাস্তা দিয়ে। মাধবী দেখেছিল, তারা যে জায়গায় বসত সে জায়গায় অনাদি বসল। রুমালে চোখ মুছে সে কি বলল, সে কথা তার কানে আসে নি। অনাদির সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থা মাধবীর ছিল না। তবুও ছুটে গিয়েছিল। অনাদি তাকে দেখে নি। মাধবী মনে করেছিল অনাদিদা হয়তো একজনেরই সঙ্গে কথা বলতে চায়—সে হল মাধবী।

হঠাৎ সূর্য উঠে পড়ে। ট্রেনটা একটু লেটে যায়। ট্রেনের শব্দ শুনতে পায় মাধবী। অদৃশ্য হাত দুটো তার সামনে ভেসে ওঠে। নদীর জলে বেশ কিছুক্ষণ মুখ ডুবিয়ে বসে থেকে চোখ দুটো লাল করে ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফেরে সে।

চিঠিটা পাওয়ার পর তার সেদিনের সব কথা মনে পড়ে যায়। তার মনে হয়—অনাদিদা কি সৃষ্টির পথ বন্ধ করে দিল? অনাদিদা কি আবার মীনাক্ষী জোগাড় করল? অনাদিদা কেমন থাকল? কেন এত সব মেয়ে থাকতে আমাকেই চিঠি দিল? বেশ তো ভুলে ছিলাম, আবার কেন আঘাত? ভগবান! তোমার লীলা আর কত দিন চলবে?

নানা ধরনের চিন্তা হতে লাগল। আবার সে সান্ত্বনাও দিতে লাগল নিজেকে। মাধবী সুযোগ বুঝে ছুটে যায় তার সেই পরিচিত জায়গায়। দেখে সবই ঠিক আছে। সেই গাছ, সেই বটগাছ, নদী, পাখীর ডাক, শুধু নেই বাঁশিয়াল। চারিদিকে তাকিয়ে চিঠিটা খোলে—

আস্তে আস্তে পড়ে চিঠিটা। আবার বন্ধ করে। পুনরায় পড়ে। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে, মাধবীর দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাধবী নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে এক বার ছুটে যায় এ গাছ তলায়, একবার ও গাছ তলায়। তার কানে যেন বাজতে থাকে বাঁশির সেই সুর—"তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে, কেউ তা জানে না…"

ঝির ঝিরে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো দুলতে লাগল। নদী আপন মনেই বয়ে যায়। আবার মাধবী ছুটে যায় দুটি তাল গাছের মাঝে। কিন্তু 'দেবতা নেই দ্বারে'। অবশেষে মাধবীলতা গাছ হতে

মাটিতে পড়ে গেল। সব আশা নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে মনে মনে শাঁখা সিঁদুর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিধবা হয়ে বাড়ী ফেরে।

বাড়ী ফিরে পেটের ব্যথার ছুতো করে শুয়ে পড়ে। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করে—কি হলো তোর ?

—পেটে ব্যথা করছে।

—ওষুধ খাবি ?

—বক্ বক্ করো না তো। আমি কিছুই খাব না।

সাবিত্রী রেগে ওঠে। ধমক দিয়ে বলে—ব্যাপারটা বলবি তো ?

—কিছু না।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খায় সে। তারপর আবার শুয়ে পড়ে। তার মনে ওঠে মরুভূমির ঝড়। সে সব সময়েই মনকে বোঝায়—সে বিধবা। কারণ সে মনে মনে আইবুড়ো নাম কাটিয়ে নিয়েছে। সে জানে তার বাবা তার বিয়ে দিতে পারবে না। সে জেনে গেছে তার অনাদি মারা গেছে। মাধবী নিজেকে যে জায়গায় দাঁড় করায় সেটা হল দুঃখ।

এদিকে মীনাক্ষী কোন প্রকারে খবর পায় যে অনাদি মাধবীকে চিঠি দিয়েছে। চুপ চুপ করে এসে মাধবীর কাছে উপস্থিত হয় সে।

—মাধবী তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?

—কর।

চারিদিক তাকিয়ে বলে—তোর মা কোথায় গেল ?

—চাল আনতে।

—তোকে অনাদি কোন চিঠি দিয়েছে ?

—না তো !

—মিথ্যা কথা বলছিস্।

—কোন চিঠি পাই নি। আর আমাকে কেন চিঠি দেবে ? অনাদিদার সঙ্গে আমার তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না।

—তা না, এমনি তো চিঠি দিতে পারে !

বেশ কিছুক্ষণ ধরে জেরাজুরি করার পর মাধবী বলে—তুমি কাউকে বলবে না তো ?

—কেন বলব ? এটা তো গোপনীয় ব্যাপার।

—একটা চিঠি দিয়েছে।

চিঠিটা বের করে সে মীনাক্ষীর হাতে দেয়।

মীনাক্ষী চিঠিটার আদ্যপান্ত পড়ে বলে—জানিস, এত বড় শয়তান আর পৃথিবীতে নেই।

—কে ? কি হল আবার ?

না জানার ভাণ করে মাধবী।

—ও আমার বাগদত্তা। আমার এই দেহের অধিকারী।

মাধবী হেসে ওঠে—তোমরা তাহলে অনেক দূর এগিয়েছিলে।

—সে তোকে বলতে আমার লজ্জা নেই। ও আমাকে তারাপীঠ, দীঘা, পুরী আরও অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে আমি ওর বউ হয়ে রাত্রিবাস করেছি হোটেলে।

মাধবী আবার হেসে ওঠে।

মীনাক্ষী একটু বিরক্ত বোধ করে—জানিস, ওর কুষ্ঠ হবে। ও অপবিত্র।

– কিন্তু তুমি যা বললে তাতে বল তুমি ভুল করেছ। মেয়েদের এতদূর এগিয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সেখানে সামাজিক স্বীকৃতি নেই।

—ভুল করেছি। কিন্তু চিঠিতে কোন ঠিকানাও দেয় নি। বারাসত। কোথায় খুঁজে পাই ?

—আচ্ছা মীনাক্ষীদি, কোন ছবি নেই তোমাদের ?

—আমাদের ছবি বলতে ?

—তোমরা দুজনে ছবি তুলিয়ে রাখ নি ?

—সেদিকে খুবই সচেতন। একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় নি।

—সব দিকটায় ভুল করে ফেলেছো।

—একেবারে পেশাদারী লাভার। আবার মাঝে মাঝে বলতো আমি প্রয়োজনবাদে বিশ্বাসী। তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুই তো মাঝে মাঝে গল্প-টল্প করতিস, কি বুঝতিস ?

—একজন ভাল শিল্পী। একজন উদাসীন মানুষ। সব সময়েই

যেন আত্মমনা লোক।

—মাধবী!

—আমার কাছে কোনদিনই তার দুর্বলতা প্রকাশ করে নি। সব সময়েই আমার বাবার কিভাবে উন্নতি হবে সেই চিন্তা করত। সুতরাং আমরা কি করে তাকে খারাপ বলি?

—ভুল করছিস, সবই ওর ছলনা। প্রয়োজনবাদ সমাজকে ধ্বংস করবে। প্রয়োজনে মানুষ চুরি করে, সেটা কি ঠিক?

—অনাদিদার সঙ্গে আমাদের কি দরকার আছে? আর ও তো কোনদিন আসবে না। সুতরাং মরা ছেলে নিয়ে মায়া বাড়িয়ে কি লাভ মীনাক্ষীদি।

সাবিত্রী চলে আসে। কথা বন্ধ হয়ে যায়।

সাবিত্রী বলে—ও মীনাক্ষী, কখন এলে? দেখ না আজ মাধুর শরীরটা খারাপ।

মীনাক্ষী তেমন কিছু বলে না। এড়িয়ে যায়। বলে—বৌদি, অনেকক্ষণ এসেছি। এখন আসি।

মীনাক্ষী চলে যাওয়ার পর সাবিত্রীর কৌতূহল বেড়ে যায়। মাধবীর কাছে গিয়ে বলে—কি ব্যাপার মাধবী?

—কিছু না।

—ঠিক করে বল। কিছু একটা হয়েছে। অনাদির ব্যাপার জিজ্ঞাসা করছিল নাকি?

মাধবী আর না বলে থাকতে পারে না।

—হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করছিল কোন চিঠি দিয়েছে কিনা।

—কেন, তোকে চিঠি দিয়েছে নাকি?

—আমাকে কেন চিঠি দেবে? ও আমার কে?

—সত্য করে বল।

মাধবী আমতা আমতা করতে থাকলে সাবিত্রী বুঝতে পারে। মাধবী লুকিয়ে রাখা চিঠিটা মায়ের হাতে দেয়।

সাবিত্রী পড়ে বলে—তোর মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছে।

—তুমি যেন বাবাকে বলো না।

—আর কি হবে। তবে আমি ছেলেটাকে স্নেহ করতাম, ওর মধ্যে একটা প্রতিভা আছে। কলোনীর লোকেরা যাই বলুক।

মাধবী চুপ করে থাকে। জীবানন্দ, কানাইও এসে উপস্থিত হয়। সাবিত্রী অবশ্য জীবানন্দকে সব বলেই ফেলে।

জীবানন্দও একই কথা বলে—লোকে যে যা বলে বলুক। অনাদি প্রতিভাধর ছেলে। আমাদের জন্য চিন্তা করে। শুধু আমাদের জন্য নয়, অনেক মানুষের কথা সে চিন্তা করে। ওই ধরনের ছেলেকে যদি জামাই হিসেবে পাই, আমরা ধন্য হব।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—কেন কমিউনিস্ট বলে ?

—অবশ্যই নয়, ওর বিবেক আছে। ওর সম্পর্কে যেটা রটেছে, দেখতে হবে সেখানেও রাজনীতি আছে কিনা। আর মীনাক্ষীও তো ভাল মেয়ে নয়।

মাধবীর মধ্যে যেন ক্ষীণ আনন্দের স্রোত বয়ে যায়। কারণ সে জানত, তার বাবা অন্তত বোঝে কার মধ্যে কি আছে। তবে সে কোন দিনই ধারণার মধ্যে আনতে পারে নি যে অনাদি তাকে বিয়ে করবে।

।। ছয় ।।

বারাসত

শ্রদ্ধেয় জীবানন্দদা, নবপল্লী

পত্রে আমার নমস্কার জানবেন। আপনার ছেলের চাকরীর জন্য আমি যে কথা আপনাকে বলেছিলাম, মামা রাজী হয়েছেন। মামা যে কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার, সেই কোম্পানীতেই চাকরী হবে ! মামাকে ভালভাবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠিক করেছি। মামা ভবানীপুরে থাকেন। যদি কানাই চাকরী করতে ইচ্ছুক হয় তা হলে অতি সত্বর

আমার সঙ্গে দেখা করুন। চিঠিটা যেন কেউ না দেখে।

নমস্কার নেবেন—

ইতি—

অনাদি।

NB—নবপল্লীর হীরেন সরকারের বাড়ীতে থাকি।

চিঠিটা পোষ্ট করে দিয়ে অনাদি চলে যায় ধর্মতলা। কারণ সে আবার মীনাক্ষী জোগাড় করেছে। ধর্মতলায় পিয়ারলেস অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অনাদি। হঠাৎ তার সামনে একটা গাড়ী এসে থামে। গাড়ী থেকে হাতটা বের করে অনাদির কাঁধে হাত দেয়। অনাদি প্রথমে চমকে ওঠে। তারপর দেখে, সেই প্রয়োজনবাদের প্রবক্তা দত্তরায়। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। গোটা বিষয়টাই সেক্স।

অনাদি অবশ্য বলেই দেয়—আজকে আমার বান্ধবী আসবে। তারপর একটা হোটেলে যাব।

গাড়ীটা সাঁ করে বেরিয়ে যায়। কিন্তু অনাদি দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর তার বান্ধবী এসে উপস্থিত হয়। কথায় বলে মাতালে মাতাল চেনে, প্রেমে চেনে প্রেম। চোরে চোর চেনে, সাহেব চেনে মেম।

অনাদি চলে যায় শিয়ালদহ, কোন একটি হোটেলের উদ্দেশ্যে।

তিন দিনের মধ্যে চিঠি পেয়ে যায় জীবানন্দ। পিওন তারই হাতে চিঠিটা দেয়। তাড়াতাড়ি কানাই খোলে। মনে মনে একবার পড়ে বলে—অনাদিবাবুর চিঠি।

—কি লিখেছে ?

—আমার চাকরী করে দিয়েছে।

—অ্যাঁ !

উচ্চৈস্বরে চিঠিটা পড়ে শোনায় কানাই। জীবানন্দ বলে—যা তোর মাকে খবরটা দে।

—কিন্তু চিঠিটা গোপন রাখতে বলেছে।

—হ্যাঁ, শুধু তোর মাকে বলবি।

কানাই তাড়াতাড়ি সাবিত্রীকে খবরটা দেয়। মাধবীর মুখ থেকে আনন্দ ঝড়ে পড়ে।

সাবিত্রী বলে—এখন কাউকেই কিছু বলিস না। তোর বাবাকে ডেকে আন।

কানাই আবার আসে দোকানে। তারপর দোকান বন্ধ করে ফেরে বাড়ী। বিকেলের মধ্যে দোকান বন্ধ হওয়ায় অনেকেরই কৌতূহল বাড়ে। কিন্তু কাউকেই কিছু বলে না তারা।

পরের দিন ভোর বেলা বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ধরে জীবানন্দ এবং কানাই। রবিবার, সুতরাং অনাদির দেখা তারা পাবেই।

একটা বেজে যায় তাদের পৌঁছাতে। অনাদি অবশ্য বাড়ীতেই ছিল। যথেষ্ঠ আদর-যত্নে তাদের খাওয়ায়।

জীবানন্দ বলে—আজকে কিন্তু ফিরতে হবে!

—আজকে ফেরা যাবে না। আর কানাইকে তো জয়েন্ট করতে হবে।

অনাদি ফোন করে। অনাদির মামাবাবু সরাসরি কারখানায় যেতে বলে। জীবানন্দ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। অনাদি তখনও চুপচাপ। যতক্ষণ না জয়েন্ট করাতে পারছে।

কাল থেকেই থাকতে হবে শুনে জীবানন্দ একটু ঘাবড়ে যায়—টাকা পয়সা তো আনা হয় নি। জামা-কপড়…

অনাদি নিজেই বলে—তার জন্যে তো অনাদি আছে।

অনাদি পাকে-প্রকান্তরে একবার জিজ্ঞাসা করতে চায়, মাধবী কেমন আছে? সে বলতে চায়—মাধবীকে আমি জীবনের চিরসঙ্গিনী করতে চাই।

কথাটা অবশ্য অনাদিকে বলতে হয় নি। দারুণভাবে আপ্লায়িত

হওয়ার পর রাতে শোবার সময় জীবানন্দ বলেই ফেলে—মাধবীকে চিঠি দিয়েছিলে···মাধবীর মার খুবই আনন্দ।

অনাদি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইলেও জীবানন্দ প্রসঙ্গটা ধরেই রাখে। কানাই বেশ বিরক্ত হয়। জীবানন্দের কাছে কানাই-এর চাকরীর থেকে মাধবীর বিয়েটাই বড়।

অনাদি বলেই ফেলে—আমি জীবনে যত মেয়ের সঙ্গে মিশেছি, মাধবীর মতো মেয়ে দেখলাম না। বাবার প্রতি অগাধ বিশ্বাস। সৎ, নম্র, ভদ্র, নির্মল চরিত্র। তাই একটা চিঠি না দিয়ে পারলাম না। হয়তো আমি কলোনীতে খুব ভাল নাম নিয়ে আসতে পারি নি। তবে আমিও তো মানুষ। চিন্তা যা করেছি, আপনাদের জন্যেই। কারণ আমার আর কেউ নেই। এক ভাই, সে ফরেনে, ইঞ্জিনীয়ার।

জীবানন্দ অনাদির মনোভাব কিছুটা বুঝতে পারে। তবে বেশী কিছু না বলে চুপ করে যায়। সে সাবিত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই যা করার ঠিক করবে।

অনাদির আপ্যায়নে জীবানন্দ মুগ্ধ হয়ে যায়। অনাদি কানাইকে বলে—বেহালায় থাকতে হবে। আমি মেস ঠিক করেই রেখেছি। এখন বাড়ী গিয়ে কোন লাভ নেই।

জীবানন্দের জিজ্ঞাসাটা অনেকক্ষণ লুকিয়ে ছিল—মাইনে কত?

—এখন তো ট্রেনিং। বারশ টাকার মতো দেবে। তারপর পারমান্যাণ্ট হলে দু হাজার টাকা হবে।

মৃদু হাসি বেরোয় কানাই-এর মুখ থেকে।

জীবানন্দ আবার বলে—বিছানা, জামা কাপড়······

—সব ব্যবস্থাই করে দেব।

অনাদি জানে, সব কিছুই কিনতে হবে। সুতরাং জীবানন্দকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই।

রাতটা বেশ আনন্দেই কাটে। সকালেই অনাদি এবং কানাই জীবানন্দকে ট্রেনে তুলে দেওয়ার জন্য স্টেশনে আসে।

জীবানন্দ বলে—আমি না গেলে তো বাড়ীর লোকেরা উপোস

যাবে। তবে যদি একদিন থাকতে হয় থাকব। ওরা যেভাবেই হোক ম্যানেজ করবে।

কানাই বলে—তোমার থাকার দরকার নেই।

অনাদিও বলে—ঠিক আছে, আপনি যান।

পকেট থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে বলে—জীবানন্দদা এটা রাখুন।

কিন্তু জীবানন্দ এ ধরনের পয়সা নিতে অভ্যস্ত নন। অনাদি খুবই রেগে ওঠে। বলে—এটা ঘুষ নয়। আপনার রাস্তা খরচা।

বিষয়টি যাতে অন্যদিকে চলে না যায় সেইজন্য জীবানন্দ টাকাটা নেয়।

উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই ছিল। অনাদি সম্পর্কে কানাইয়ের যে ধারণাটা ছিল তা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলে—আপনি আমাদের পরিবারটাকে সত্যই উদ্ধার করলেন।

অনাদি পকেট থেকে কয়েকটি একশ টাকার নোট বের করে বলল—তোমার খরচ।

—কত আছে?

—পাঁচশ। তোমার যেদিন সুবিধে হবে সেদিন শোধ করবে। পরিশোধ করার মতো মানসিকতা যেন থাকে। আর একটা কথা মনে রেখো—বাবা মাকে টাকা পাঠাবে। বাবাকে যেন আর হাতুড়ি ঠুকতে না হয়।

কানাই কোন কথার উত্তর দেয় না। প্রত্যেকটি কথা তার হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে যায়। হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা অনাদির পায়ে লুটিয়ে পড়ে। কলোনীর শত শত লোকের ঘৃণা, নানা জনের থুৎকার সবই মনে পড়তে থাকে কানাই-এর। অনাদিবাবু কাউকেই কলঙ্কিত করেন নি। যারা কলঙ্কিত, তারাই কলঙ্কিত হয়েছে। উন্মাদনা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে।

অনাদির চরিত্রটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সে কতকগুলো চরিত্রহীন মহিলা নিয়ে পরীক্ষা করেছে। বুকে কান লাগিয়ে শুনেছে, তারা

কেউই সৎ নয়। প্রত্যেকটি কথার মধ্যে অসততা। বিবেকের কাছে প্রশ্ন রেখেছে—কেন তারা অসৎ হল ? কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি তো অনেকেরই আসে। তবে তাকে সবটাই জ্ঞান দিয়েছিল মাধবী !

মাধবীদের বাড়ীতে আনন্দের ঢেউ বইতে থাকে। কলোনীর মানুষরা যে তাদেরকে এত ভালবাসে জীবানন্দ জানত না। কিন্তু অনাদি জানত। মাধবীর জন্য অনেকেই তাকে বলেছিল।

কানাই-এর চাকরীর খবর সকলেই জেনে ফেলে। জীবানন্দ কোন দিনই সত্যকে লুকিয়ে রাখার পক্ষপাতী নয়। তাই গলা ফাটিয়েই বলে—দেখে এলাম অনাদির প্রতিপত্তি। সত্যকারের হৃদয়বান ছেলে।

সাবিত্রী বলে ওঠে—আমি আগেই বলেছিলাম, যে যা বলছে বলুক, অনাদি মানুষ, অনাদি বড় শিল্পী।

—হ্যাঁ। বাঁশি বাজিয়ে খুবই নাম করেছে। কলকাতার একটা অনুষ্ঠান দূরদর্শন তুলে রেখেছে। খুব শিঘ্রই দেখাবে। তাতে অনাদি আছে।

মাধবীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। একে একে তার দেহ থেকে সমস্ত পার্টসগুলো যেন খসে খসে পড়তে থাকে। পতনোন্মুখ অশ্রুতে সারা বিশ্বটা অন্ধকার হয়ে আসে।

মীনাক্ষীও আসে। বাড়ীর মধ্যে একটা যেন নীরবতা আসে। মাধবীর চোখ দুটো লাল হয়ে ওঠে। জীবানন্দকে বলে—অনাদিদার ঠিকানাটা দিতে পারেন।

—আমার কাছে তো কোন ঠিকানা নেই।

– কেন ? আপনারা তো গিয়েছিলেন।

—কিন্তু সে কথা ও কাউকে বলতে নিষেধ করেছে। এখন যদি বলি আমাদের ক্ষতি করে দেবে।

মাধবীও গর্জে ওঠে—কেন দেবে ঠিকানা ?

সাবিত্রী একটু সান্ত্বনার সুরে বলে—মীনাক্ষী, তুমি ঠিকানা দিয়ে

কি করবে ?

মীনাক্ষী একটু নরম হয়ে যায়—না, একটু দরকার ছিল।

—কি দরকার, বল না। মাধুর বাবা তো যাবে বলে দেবে।

—সবাইকে কি সব কথা বলা যায় ?

—সবাইকে কি সকলের ঠিকানা দেওয়া যায় ?

—একটু উপকার করবেন না ?

—কিন্তু তোমার উপকারে যদি আমাদের ক্ষতি হয়, সে উপকার কেন করব ?

—বেশ, ঠিক আছে।

মীনাক্ষী গতি খারাপ দেখে চলে যায়। সাবিত্রী তার সমস্ত ঘটনা জানে। শুধু সাবিত্রী কেন, সকলেই জানে। একটা নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অনাদিকে গ্রাস করতে চেয়েছিল মীনাক্ষী। বুঝেছিল, অনাদি তার কুক্ষিগত। কিন্তু অনাদি যত বড় না প্রেমিক, তার চেয়ে একজন বড় গবেষক। সে দীর্ঘদিন রাজনীতি করার পর এমন একটি Dept.-এ চাকরী করছে যেখানে সৃষ্টি এবং সমাজ দুটোই আছে। প্রয়োজনবাদে বিশ্বাস করলেও সত্যকে অস্বীকার করে নি।

মীনাক্ষী কোন উপায় না দেখে পাড়ায় রটিয়ে দেয়—মাধবীর সঙ্গে অনাদির সম্পর্ক খুবই খারাপ। তাকে ভোগ করার অজুহাতেই ভাই-এর চাকরী করে দিয়েছে। জীবানন্দকে টাকা দিয়েছে। সে সুরঙ্গ করছে মাধবীর বাড়ীতে ঢোকার।

বেশ কয়েকজন মাধবীকে মীনাক্ষীর মন্তব্যগুলো বলে। জীবানন্দও শোনে। শোনে অলকা। মেয়েদের মন সাধারণত অল্পে গলে যায়। কিন্তু জীবানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস অনাদি ক্ষতি করতে চায় না। আর কি করে করবে ? কারণ সে তো থাকে বারাসতে।

মাধবী অবশ্য স্পষ্ট করেই বলে দেয়—অনাদির সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর। তবে দৈহিক নয়—মনের।

কথাগুলো মাধবী মন থেকে বলে না। কারণ মনে মনে সে বিধবা। স্বামীকে জীবন্ত করার প্রেরণা কোনদিন সে পাবে, এ আশা

তার নেই। শুধু ভাবে, তার জীবনের শেষ সন্ধ্যা বেলা ঐ ময়ূরাক্ষী।

সাবিত্রী অনেকটাই আশাবাদী। রাতে জীবানন্দকে বলে—তুমি কি বুঝলে? মাধুর সম্পর্কে কি বলছিল?

—আমার যতটুকু ধারণা, ও সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। সব সময়েই একটা অনুতাপের সুর।

—একটা চিঠি দিলে হয় না? অবশ্য তুমি আমার থেকে বেশী বোঝ।

—কিছুদিন অপেক্ষা কর। না হয় কানাই তো চাকরী পেয়েছে, এবার কিছু একটা ব্যবস্থা করব।

রাতের ঘুমগুলো আগের থেকে অনেক আরামের। দুরাশার আকাশ পরিষ্কার হয়ে শুভ্র মেঘের উদয় হয় সাবিত্রীর সংসারে। সাবিত্রী পুনরায় স্বপ্ন দেখে সাদা হাতির।

॥ সাত ॥

বারাসত

প্রিয়,

মাধবী, পুনরায় চিঠি দিলাম। আমি এখান থেকেই বুঝতে পারছি আমার চিঠি দেওয়ার পর কলোনীতে বেশ আলোচনার ঝড় ওঠে। তোমাকে কোন শক্তিই ছোট করতে পারবে না। আমি তোমার কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি, আমাকে সব সময়েই তাড়িত করে একটা শক্তি। আমার মনটাকে বেদনাক্রান্ত করে। মনে হয়, করছি কি? এখনও সময় আছে। এখন সংসার-জীবনে প্রবেশ করলে জীবনটা সুস্থ হবে। এখনও অশুভ শক্তির পিছনে, নিষিদ্ধ পল্লীর গলিতে গলিতে ঘুরছি। তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, তোমার যদি ইচ্ছা হয় এই অসৎ, মদ্যপ লোকটিকে উদ্ধার করতে, তোমার বাবার মতামত নিয়ে, তবে তোমার ব্যক্তি ইচ্ছায় নয়, চিঠি দিতে পার।

একটা কথা মনে রাখবে, আমি ভাল নই। ভাল করার দায়িত্ব তোমার। বেশি কিছু বলার নেই। কারণ তোমার বোঝার শক্তি আছে। আমাকে বোঝারও শক্তি আছে। এটা আমার বিশ্বাস। তোমার ভাই-এর উনতি হবে। গুরুজনদের আমার শ্রদ্ধা দিও। তুমি ভালবাসা নিও।

অনাদি

চিঠিটা গভীর রাতে লেখে অনাদি। বারবার পড়ে। ভয় হয়, যদি জীবানন্দদা ভুল বোঝে। যদি মাধবী কিছু মনে করে। কিন্তু কোন কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত না হয়ে পরের দিন পোষ্ট করে।

তিন দিন পর। মাধবী কাপড় কেচে বাড়ী ফিরছে, চিঠিটা পিওন এসে দিয়ে যায়। প্রথমে ভাবে ভাই-এর চিঠি। কিন্তু খুলে দেখে, অনাদি পাঠিয়েছে। লুকিয়ে নেয়। আবার ছুটে আসে নদীর ধারে। কে এক রাখাল গলা ছেড়ে গান গাইছে—

ময়ূরাক্ষী…ও ময়ূরাক্ষী
তোর কূইলে, বইসা ভাবি,
আমার মরদ কোথায় গেল—
…ময়ূরাক্ষী…ও ময়ূরাক্ষী।
ছিঁইড়ে গেল হৃদয় আমার,
হাতের শাঁখা-চুড়ি
…ময়ূরাক্ষী…ও ময়ূরাক্ষী…

ছিলেম সুখে দুই জনেতে
ঘরটি বাঁইধে মাঠে—
বজ্রাঘাতে নিইভে গেল
আমার জীবন শশী।
আজ চিতার পাশে বইসা আসি
তোর লাইগা কাঁদি…
·ও

এক নিমেষে চিঠিটা পড়ে ফেলে মাধবী। কিন্তু গান তখনও চলে। মাধবীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যেন একটা চিতা জ্বলছে। চিতার পাশে বসে তার স্ত্রী কাঁদছে। মাধবীরও বুক ভেসে যায় চোখের জলে। ক্ষীণ গতিতে ময়ূরাক্ষী বেয়ে চলে। হঠাৎই চিঠিটা আঁচলের মধ্যে ভরে নেয় সে। কিছুক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বসে। আবার চিঠিটা খোলে।

—একটা অসৎ ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা আমার আছে!

মায়ের কাছে এসে চিঠিটা দেখায়। সাবিত্রী বলে—তোর বাবা ঠিকই বলেছিল, ধৈর্য ধর। কয়েক দিনের মধ্যেই ফল পেলাম। তোর বাবাকে চিঠিটা দেখাতে হবে। এখন তোর ভাগ্য!

মাধবী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে আবার ভাবে—তাহলে সে হয়তো বিধবা হয় নি। অনাদি মরে নি।

সাবিত্রী আবার বলে—তবে সাবধান, পাড়ার কেউ যেন জানতে না পারে।

—বাবাকে দেখিয়ে আসব?

—না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এখনই তো আসবে।

অনাদি বারাসত থেকে রিমোট-এর সাহায্যে বোমা ফাটাতে থাকে। তার এক একটা চিঠি একটা পরিবারকে আশার আলো দেখাতে থাকে।

বেশী দেরি হয় না জীবানন্দের ফিরতে। ফিরে আসতেই সাবিত্রী হেসে ওঠে।

—কি হল, হাসছ যে?

—চিঠি এসেছে।

—কার চিঠি?

—আবার কার। অনাদি চিঠি দিয়েছে।

চিঠিটা খুব ভাল ভাবে জীবানন্দ পড়ে।

—বলতো চিঠিটার মধ্যে একটা প্রাণ ভেসে ওঠে নি?

—তোমাকে মনে হচ্ছে একজন কবি।

—তুমি পড়েছ তো ?

—বার কয়েক পড়েছি।

মাধবী নির্বাক। সে শুধু একবার দেখে বাবাকে, একবার মাকে। কিন্তু ভবিষ্যৎ কোথায় ?—

চায়ের কাপ দুটো এনে বাবাকে এবং মাকে দেয় মাধবী।

সাবিত্রী বলে—তোমার মত নিয়ে কাজ করতে বলেছে। তুমি একটা চিঠি দাও না।

—আমি দেব না, মাধবী দেবে।

—সেটা বোঝ।

—মাধবীই দেবে। কারণ সমাজ করে বিয়ে দেওয়া হবে না। অনেক ঝড় উঠবে। কোর্ট ম্যারেজ হবে। চুপ করে আমরা চলে যাব। বলব বেড়াতে যাচ্ছি।

—সেটাই ভাল হবে। আর সমাজ করে বিয়ে দিলে টাকা-পয়সা খরচ হবে। কোথায় পাব।

—তাছাড়া ঝড় উঠতে পারে।

—সেটা বুঝি। চিঠি দিয়ে মতামতটা নিক।

মাধবীকে আর কিছুই বলতে হয় না। সব কিছুই বসে বসে শোনে। বাবার অনুমতি পেয়েই সে কলম ধরে। এটাই তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র বলা যায়। অনেকে অনেকের ভাল লাগে। ভালবাসা জন্মে চোখে চোখে, আবার কখনও বাস্তবে। রোমান্স এবং বাস্তব দুই-এর মাঝে প্রেমিক প্রেমিকারা সাঁতার কাটে। মাধবীর জীবনে সব কিছুই ছিল অলীক।

পূজনীয়,

অনাদিদা, পত্রে আমার প্রণাম নিও। তোমার চিঠি আমার বৈধব্যের মশাল। ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ। তোমার মত একজন শিল্পীকে আমি চিনে ছিলাম। তুমি এখনও বেঁচে আছ! সত্যই তুমি অনাদি। আমি তো মাধবীলতা। আশ্রয় ছাড়া দাঁড়াতে পারি না। তাই সব সময়েই তোমার আশ্রয় চাই। তোমার মত

একজন স-কার সুপুরুষ ছেলের হাতে কোন মেয়েকে সঁপে দিতে কোন বাবা-মার আপত্তি থাকতে পারে না।

……ময়ুরাক্ষীর ধারে বসে থাকা সেই সব দিনগুলো বোধ হয় তোমার মনে আছে। মনে হোত, আমার ছেঁড়া কাপড়টা তোমার মর্যাদা হানি করবে। কিন্তু তোমার শিল্পী হৃদয় এর জন্যে পিছিয়ে যায় নি। আমি আমাকে তোমার কাছে চিরদিনের মতো সঁপে দিতে চাই। জানি তোমার সব। তবুও শত কষ্টেও থাকতে চাই। এখানে কি ভাল আছি? কোন দিনই নয়। তবুও……

যে রাস্তা ভগবান তৈরী করেছেন মানুষের জন্য, সেই সৃষ্টির রাস্তা কেন বন্ধ করব? কেন পালিয়ে যাব? পলায়নী মনোবৃত্তি আমার নেই। তোমার চিঠির আশায় থাকলাম। ভাল থাক। ভাল হও। তোমার ভবিষ্যত হোক সুন্দর নবীনের আগমনে।

ইতি—

বুদ্ধ পূর্ণিমা   তোমার

মাধবী

সাবিত্রী মাধবীর অনেকটা বন্ধুর মতো। মাধবী সাবিত্রীকে চিঠিটা পড়িয়ে শোনায়।

সাবিত্রী বলে—দেখা যাক, কপালে কি আছে। তবে চিঠিতে একটা কথা লিখে দে, বিয়ে করলে কোর্টে গিয়ে করতে হবে।

—উত্তর দিক। সেটা ও বলবে। কারণ ও সমাজ করে বিয়ে করতে আসবে না।

—সেটা অবশ্য ঠিক।

যত্ন সহকারে খামের মধ্যে ভরে চিঠিটা পোষ্ট করে মাধবী। মাধবী মীনাক্ষীর কাছে শুনেছিল যদি অনাদি তাকে বিয়ে করে তো অনাদির বিরুদ্ধে সে থানায় F.I.R. করবে। মাধবী প্রথমে ভয় পেয়েছিল। কিন্তু যখন সে বুঝেছিল, অনাদি দই খেয়ে ভাঁড় ফেলে দিয়েছে, কোন ডকুমেণ্ট রাখে নি। তখন মৃদু হেসেছিল। মাধবী বলেছিল—তুমি বিরাট ভুল করেছ।

জবাবও পেয়েছিল— যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলের রেজিষ্টারে নাম লেখা আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল মীনাক্ষী। তারপর বলেছিল— না সেখানে আমাদের নাম ঠিকানা সবই উল্টো লেখা আছে।

—তাহলে। সব জায়গায়ই ফেঁসে আছ।

—কেস কিন্তু করবই।

মাধবী মনে মনে চিন্তা করেছিল এ রকমে কেস হয়তো অনেকেই করবে। কিন্তু কে প্রমাণ করবে, কে দোষী?

আবার মৃদু হাসি। ভারতবর্ষের যা আইন তাতে খুন হলেও প্রমাণ করতে হিমসিম খেতে হয় নিহতের আত্মীয়দের। সুতরাং মাধবী জানত, অনাদির সঙ্গে কোন মেয়ের কোন ম্যারেজ হয় নি। ভয় তার নেই। আর মীনাক্ষী তার ভুলের মাসুল গুনুক। মীনাক্ষী আবার ভুল করছে সে খবরও মাধবী রাখে। এটা তার স্বভাব ব্যবসা। সে 'প্রয়োজনবাদে' বিশ্বাসী।

বেশ কিছুদিন ধরে অনাদি বাড়ী ছাড়া। সে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে যাওয়ায় চিঠিটা বাড়ীর মধ্যে পড়েই থাকে। অবশ্য অনাদি জানত মাধবী তাকে রেস্পন্স দেবে। সে অনেকের কাছে মাধবীর কথা বলেছে। অথচ যারা তাকে সব কিছুই দিয়েছে তাদের কথা কাউকেই বলত না। ঘৃণা করত।

প্রায় এক মাস পরে অনাদি বাড়ী ফেরে। বাড়ী ফিরতেই দেখে অনেক চিঠির গাদা। নানা জায়গা থেকে চিঠি এসেছে। একের পর একটা চিঠি উল্টে উল্টে দেখে। হঠাৎই চোখ পড়ে মাধবীর চিঠিটার ওপর। চিঠি নয়—খাম। খামের উল্টোদিকে মাধবীর নাম। লাইটের সামনে চিঠিটা ধরে যত্ন করে কাটে। আগ্রহভরা চোখ দুটো নিয়ে পড়তে থাকে।

মনে মনে পড়তে পড়তে হঠাৎই বলে ওঠে—

…সত্যই তুমি অনাদি !…

…তোমার চিঠির আশায় রইলাম…

…ছেঁড়া কাপড়টা…

…মাধবী…

স্থির দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকে সে। পুরনো সব দৃশ্যগুলোকে আবার ঝালিয়ে নেয়। সমাজ করে বিয়ে করার পক্ষপাতী সে কোন দিনই নয়।

মদের বোতলটা খুলতে গিয়ে মাধবীর মুখটা মনে পড়ে…প্রজন্ম… নবজাতক।…না ভাল হতে হবে…

সব কথাগুলো শোনে ঘরের দেওয়ালগুলো। কতগুলো টিকটিকি, সরিয়ে রাখে মদের বোতলটা।

ডায়েরী থেকে খাম এবং কাগজ বের করে মাত্র কয়েকটি কথায় চিঠি লেখে—

প্রিয় মাধবী,

তোমার জন্য আমার দরজা খোলা আছে। তোমাকে আমি আইনগত স্বীকৃতি দিয়ে বাড়ীতে আনতে চাই। ইতি—

তোমার

অনাদি

খামের মধ্যে সযত্নে ভরে রাখে পোষ্ট করার জন্য।

মাধবী প্রায়ই শর্মিলাদের বাড়ী টিভি দেখতে যায়। আগে মীনাক্ষীদের বাড়ী যেত। মীনাক্ষীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর শর্মিলাদের বাড়ী যায়। শর্মিলা মাধবীকে খুবই ভালবাসে। অনেকেই মাধবীকে অনাদি সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিল, কিন্তু শর্মিলা বলেছিল—ওরে, পুরুষ মানুষের সব দোষ ধরলে হয় না। আর এর জন্য মেয়েরাই তো দায়ী। মেয়েরা যায় কেন ?

মাধবীর শুনতে ভাল লেগেছিল। শর্মিলা অনেক ভাবেই মাধবীকে

সাহায্য করে। সেদিন টিভি দেখতে দেখতে হঠাৎই অনাদির ছবি ভেসে ওঠে টিভির পর্দায়। মাধবী তো চমকে ওঠে, শর্মিলা চিৎকার করে ওঠে। এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অনাদি বাঁশি বাজাচ্ছে। সেই পরিচিত সুর। রবীন্দ্রসংগীত।

মাধবী তার বাবার কাছে শুনেছিল কোন একদিন অনাদিকে দেখানো হবে টিভির পর্দায়।

অনাদির ছবি ভেসে ওঠা মাত্র সকলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চিৎকার ওঠে সারা কলোনী জুড়ে। নানান জন পূর্ব স্মৃতিগুলোকে টেনে হিঁচরে বের করে আনে মন থেকে।

মাধবী দেখে—অনাদিদা কত ধীর, কত স্থির, কত চিন্তাশীল। কত বোঝে রবীন্দ্রসংগীত। কি ভাব!

…"তুমি যে ছেয়ে আছ"…

শর্মিলা মাধবীকে খোঁচা মারে। মাধবী চমকে ওঠে। মৃদু হাসি তার ঠোঁটে।

কানে কানে বলে—ধরে রাখতে পারলে আজ…

—সে কপাল আমার নয়।

—আচ্ছা, মীনাক্ষীও বোধ হয় দেখছে?

—কে জানে, দেখতেও পারে।

—একটা চিঠি দিলে হয় না?

—কি ভাববে।

—সেটা ঠিকই। এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।…অথচ আমাদের সেই অনাদিদা।

খবরটা বাবাকে দেওয়ার জন্য মাধবী তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে।

—বাবা তুমি বলেছিলে, আজকে অনাদিদাকে টিভিতে দেখলাম, টিভিতে!

—হ্যাঁ, আমি জানতাম। ও বড় হবেই।

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—ভগবান ওর উন্নতি করুক।

—হ্যাঁ, আমরা ওর কাছে চির কৃতজ্ঞ।

কানাই বাড়ীতে সাতশ টাকা পাঠিয়েছে, এবং প্রতি মাসে সাতশ টাকা করেই পাঠাবে বলে জানিয়েছে। বাবাকে বেশী পরিশ্রম করতে নিষেধ করেছে। দিদির জন্য তার দারুণ চিন্তা। এ কথাও চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছে, অনাদিদা সব সময়েই নজর রাখে, যেন কত আপন, কত আগ্রহ, কত আন্তরিকতা।

চিঠি চলাচলি বেশ কিছু দিন ধরেই চলছে, লক্ষ্য সম্পর্ক স্থাপন করা। কারণ জীবানন্দের গলার কাঁটা মাধবী। তাকে কোনও ভাবে উদ্ধার করতে পারলে তার রেহাই।

এবারের চিঠিটা পিওন সরাসরি জীবানন্দের হাতে দেয়। চিঠিটা পড়ে জীবানন্দ বুঝতে পারে অনাদির প্রকৃত মনোভাব। সাবিত্রীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে তারা. ছেলের কাছে বেড়াতে যাচ্ছে বলে অনাদির ওখানে উঠবে।

তারপর কলোনীর অনেকের কাছেই তারা বলে—ছেলের ওখানে বেড়াতে চললাম।

কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্যটা গোপন রাখে। হঠাৎ একদিন বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ধরে।

॥ আট ॥

—প্রস্তাবটা কি ভাবে রাখা যায়?

—সেটা তুমি একটা ঠিক করে নাও। কারণ তুমি তো বাবা, এ সব কথা তোমাকেই বলতে হবে।

—না, সে কথা নয়, বলছিলাম প্রথমে কি বলা যায়।

—বলবে তোমার চিঠি পেয়ে এসেছি। আমি কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। তুমি তো বেশ বোঝ আমাদের যন্ত্রণা।

—ঠিক আছে, একটু গুছিয়ে বলতে হবে।

—কিছু উপস্থিত বুদ্ধির দরকার। এর জন্য রিহার্সাল দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

কথাগুলো হয় ট্রেনের মধ্যে, সাবিত্রী এবং জীবানন্দের মধ্যে। ধর্মতলা থেকে বাসে করে যাবে। ট্রেন হাওড়ায় থেমে যাবে। তারপর ট্রামে ধর্মতলা। সেখান থেকে বারাসত। কোন নোটীশ না দিয়ে তারা যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল হলে দেখা পাবে।

ভাগ্য জীবানন্দের খারাপ নয়। মাঝে কিছুদিন খারাপ হয়েছিল। তারপর প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠেছে। সে এখন মোটামুটি স্বচ্ছল। মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে বুড়ো-বুড়িতে সুখে বাস করবে। এই তাদের প্রবল ইচ্ছা। হয়তো সেই দিন তাদের এসেই গেল!

অনাদির সাক্ষাত তারা যথারীতি পায়। অনাদি তাদের দেখে অবাক। তবে অপ্রকাশিত আনন্দ তাকে ব্যাকুল করে তোলে। সে চিন্তা করতে পারে নি, বিনা মেঘে বৃষ্টি হয়।

জীবানন্দ অনাদির আন্তরিকতার সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাদের যাওয়ার খবরটা অনেকের কাছেই পৌঁছে যায়। অনাদিকে যারা ভালবাসে তাদের সকলেই ছুটে আসে। পাশের বাড়ীর বৌদিও আসে। চোখে চোখে ইশারা হয়। বোধ হয় বৌদি মাধবীর জন্য বলছে। তারপর মাধবীর গায়ে হাত দিয়ে বলে—তোমার নাম তো মাধবী।

—হ্যাঁ।

—আমি বৌদি।

মাধবী একটু হেসে বলে—তাহলে আর কোন চিন্তা নেই।

জীবানন্দ কিছু বলার আগেই রাস্তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। বৌদি মাধবীকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে যায়। রাতে থাকার ব্যবস্থা তাদেরই বাড়ীতে।

সাবিত্রী বলে—তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। রান্না যদি করতে হয় আমি করে নেব।

—সে হয় না। আপনারা আজকে অতিথি।

—না-না, সেটা কোন ব্যাপার নয়। আচ্ছা, কানাই-এর সঙ্গে দেখা করা যাবে না ?

—কেন যাবে না। আমি এখনই ফোন করে দিচ্ছি। কাল সকালেই চলে আসবে।

জীবানন্দ বলে—তুমি একটু স্থির হয়ে বস। তোমার সঙ্গে আমার কতগুলো কথা আছে।

অনাদি বলে—একটু পরে। আগে রাতের ব্যবস্থাটা করি।

—বেশী কিছু নয়।

—গরীবের বাড়ীতে বেশী কোথায় পাবেন।

পাশের বাড়ী থেকে কানাইকে ফোন করে অনাদি। বাবা মায়ের আসার খবরটা তার কাছে পৌঁছে যায়। তারপর অনাদি যায় বাজারে।

পাশের বাড়ীর বৌদি, অর্থাৎ মৌমিতা চ্যাটার্জী, একটা স্কুলের শিক্ষিকা। মাধবীকে নিয়ে বেশ আমোদ শুরু করে দেয়।

—মাধবী, তোমার কাজ এখন এই পাগলটাকে উদ্ধার করা। পারবে না ওঁকে ফেরাতে।

মাধবী কেবলই হাসে।

বৌদি আবার বলে—তোমার গল্পতো সব সময়েই শুনতাম, বলতে বলতে একেবারে রোমান্স পেরিয়ে কোথায় চলে যেত। জান, তোমাদের ঐ নদীটা আমার একবার দেখার খুব ইচ্ছে।

—চলুন না। দেখে আসবেন।

—হ্যাঁ, তোমার শুভ দিনটা পেরিয়ে যাক, তারপর একদিন যাব।

মাধবীর প্রথমে মনে হয়েছিল বৌদির সঙ্গেও বোধ হয় অনাদির কিছু একটা ব্যাপার আছে। তবে তার কথা শুনে সে ধারণা পাল্টে যায়। পাড়ার দু-চারজন মেয়েও এসে হাজির হয়।

একজন তো বলেই ফেলে—অনাদিদার চয়েস আছে।

বৌদি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—কত জায়গায় ঘুরেছে জান? সুতরাং এক্সপেরিমেণ্টের মধ্য দিয়ে চয়েস করেছে।

কেউ একজন বলে ওঠে—দিনটা কবে ?

বৌদি বলে—আগামী পরশু দিনটা ভাল।

—অনুষ্ঠান করে না, কোর্টে ?

—সেটা বলতে পারছি না। তবে একটা পার্টি তো দিতেই হবে।

—আমরা নিমন্ত্রণ পাব তো ?

—তোমাদের বাদ দিয়ে কি হবে ?

সকলেই হেসে ওঠে। মাধবী চুপ করে বসে থাকে। সব কথা-গুলো মনে গেঁথে রাখে।

এদিকে অনাদি বাজার করে ফেরে। মুরগীর মাংস, টমেটো, ডাল, সন্দেশ অনেক কিছুই নিয়ে আসে।

সাবিত্রী বলে—কি যে করছ। এত আনার কি প্রয়োজন ছিল ?

জীবানন্দ অনাদিকে কাছে বসিয়ে বলে—আমরা কিসের জন্য এসেছি, তুমি হয়তো জান।

জেনেও অজানার ভাণ করে—ছেলেকে দেখতে।

—সেটা ঠিকই। তবে আর একটা ব্যাপারেও এসেছি।

—বলুন।

—আমরা এসেছি···

চিঠিটা পকেট থেকে বের করে দেখায় জীবানন্দ। অনাদি দেখে।

জীবানন্দ বলে—তোমার সঙ্গে আমরা সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই।

—আপনারা ভালভাবে চিন্তা করে দেখুন। আমার সম্পর্কে জানুন। নতুবা পরে তখন দোষ দেবেন। তবে একটা কথা বলে রাখি, আপনাদের প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি নেই।

সাবিত্রী এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। কারণ স্বামীর ওপরে সে কোন দিনই কথা বলে না। বেশ কিছুক্ষণ পর জীবানন্দের অনুমতি পেলে বলে।

—আমাদেরও কোন আপত্তি নেই।

মাঝখানে মৌমিতা এসে উপস্থিত হয়। কথাবার্তায় সেও অংশ গ্রহণ করে।

—জানেন মাসিমা, আমাদের মধ্যে সব সময়েই মাধবীর কথা হোত।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করে—আপনার পরিচয়।

অনাদি তাড়াতাড় বলে ওঠে—আমার বৌদি। পাশের এই সুন্দর বাড়ীটা ওনার। বৌদি একটা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। দাদা ইঞ্জিনীয়ার।

জীবানন্দ একটু অন্যমনস্ক ছিল। ঘুরে তাকায়—অনাদি আমাদের ওখানে অনেকদিন ছিল। আমাদের সঙ্গে খুব মিশত। ভাল ছেলে। প্রতিভা আছে।

সাবিত্রী আবার জিজ্ঞাসা করে—আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

—একটা ছেলে। নরেন্দ্রপুরে পড়ে।

—আসল বাড়ী কোথায়?

—ফরিদপুর। বাংলাদেশ।

অনাদি আলোচনায় জল ঢেলে দিয়ে বলে—যাক বৌদি, উনারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন।

মৌমিতা একটু হেসে বলে—বলুন।

তখন সাবিত্রী সব কিছুই খুলে বলে। তাদের আর্থিক অবস্থা। কিভাবে সংসার চালায় ইত্যাদি।

পরিবেশটা তৈরী হয়েই ছিল।

মৌমিতা বলে—আগামী পরশু দিনটা ভাল। কোর্টে কাজটা সেরে নিয়ে কালীঘাটে যেতে হবে।

—কালীঘাটে যেতে হবে কেন? জীবানন্দ প্রশ্ন করে।

—কারণ শুধু বিয়ে করলেই তো হবে না। মেয়েদের একটা মঙ্গল-অমঙ্গল বলে ব্যাপার আছে। অনাদি তোমাকে একটা পার্টি দিতে হবে। সব পয়সাগুলো জমিয়ে রাখলে চলবে না। আর মাধবী, তুমিও শোন, সব কাজ পাকা করে নামতে হবে। তা না হলে ঐ পাগলটাকে বিশ্বাস নেই।

সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে। রাতের রান্নার দায়িত্বটাও মৌমিতা নেয়। তবে তাকে তেমন কিছু করতে হয় না। সব কিছুই করে সাবিত্রী।

সাবিত্রী একবার জীবানন্দকে বলে—ছেলেটাকে রাতে আনালে সবাই মিলে আনন্দ করা যেত।

—হয়তো রাতে ডিউটি আছে।

—রাতে ডিউটি করতে হয়?

—হ্যাঁ।

—শরীর খারাপ হয়ে যাবে তো?

—না-না, রাতের ডিউটি বরং ভাল।

—জানিনা কোনটা ভাল কোনটা খারাপ। তবে সকালে আসবে তো?

—মা বাবা আসার খবর যখন সে পেয়েছে তখন অবশ্যই আসবে।

রাত এগারটা হয়ে যায় নানান গল্পের মধ্যে খাওয়ার পর্ব শেষ হতে। তারপর বৌদির বাড়ীতে শোয়ার ব্যবস্থা।

সুন্দর ছবির মতো সাজানো বাড়ীটা দেখে সাবিত্রী জীবানন্দকে বলে—কানাই এ রকম একটা বাড়ী করতে পারবে না!

জীবানন্দের ভাষাটা প্রকাশের অযোগ্য হওয়ায় চেপে দেয়—শুয়ে পড়। শুভকাজ সেরে চলো ফিরে যাই বুড়ো বুড়ির জায়গায়।

মাধবী সারারাত জেগে থাকে। বৌদির বাড়ীর প্রত্যেকটি দেওয়াল, বিছানা, সোফা সব কিছুই মনের মধ্যে গেঁথে নেয়। মাঝে মাঝে মৃদু হাসি। কে যেন বলেছিল—'ভবিষ্যত তুমি কেমন, আলোকময় না। অন্ধকার।'

পরের দিন সকালেই কানাই এসে উপস্থিত হয়। তার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মা বাবাকে প্রণাম করে অনাদিকে প্রণাম করে। অনাদির স্নেহপূর্ণ চোখ দুটো তার উপরে পড়ে।

সাবিত্রী মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—ভাল আছিস তো?

—খুব সুন্দর পরিবেশ। কাজও কম। ভালই আছি। তোমরা কোন চিন্তা করো না।

জীবানন্দর ঠোঁটে মৃদু হাসি—মাধুর বিয়ে ঠিক করলাম।

—কোথায়?

সকলেই হেসে ওঠে। ততক্ষণে কানাই-এর আর বুঝতে অসুবিধা হয় না।

—কবে হচ্ছে?

—আগামী কাল। তুই অবশ্যই থাকবি।

—কিন্তু ছুটি করাতে হবে তো।

অনাদি বলে ওঠে—তার জন্যে তো আমি আছি। আর মামা তো আসবেনই।

—আসবেন? তাহলে কোন চিন্তা নেই।

চারটে গাড়ী ছুটে চলে কালীঘাটের দিকে। ওখানেই মাধবী আবার সধবা হবে। মাধবী যেদিন ভেবেছিল সে বিধবা, সে দিনের সেই ছেঁড়া কাপড়টা তার আজও আছে। কিন্তু তার গায়ে চাপানো আছে হাজার টাকার বেনারসী শাড়ী। তবে কলোনীর কোন লোকই জানতে পারে নি। জানবে পরে।

মাধবীর সব সময়েই ভয় মীনাক্ষীকে। কারণ সে যদি মামলা করে দেয়! আবার যদি মীনাক্ষীকেই বিয়ে করতে হয়। সে চিন্তা করে, তবে কি সতীন সেজে থাকব? কারণ তাকে তো সামাজিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

এই ধরনের নানা চিন্তার মধ্যে থাকার জন্য মাধবীকে একটু অন্য-মনস্ক দেখায়।

অনাদি গাড়ীর মধ্যেই আস্তে আস্তে বলে—তুমি অতো কি চিন্তা করছো বল তো?

—কিছু না।

—কোন ভয় নেই। আমি অনাদি। অতো সহজে কেউ কিছু আমার করতে পারবে না।

গাড়ীগুলো কালীঘাটে গিয়ে পৌছায়। এরপর শুরু হয় বৈদিক মন্ত্রে বিবাহ। পুরোহিতের সঙ্গে কোন ঠিকঠাক না হওয়ায় বেশ একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এক হাজার টাকা চেয়ে বসে পুরোহিত। কানাই তো মারতে যায়। পুরোহিতের দল-বল এসে ঝামেলা শুরু করে। অনাদি কোন দিনই এ সবের পক্ষপাতী নয়। পকেট থেকে টাকাটা বের বলে—ক্ষমা করবেন ঠাকুর মশাই।

—প্রথমে দিলেই হোত। এতো কিসের!

খাওয়া দাওয়া এবং অনুষ্ঠানের পর্ব সারতে বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। মাধবীর উপোস ছিল। অনাদি অবশ্য উপোস করে নি। সুতরাং ভাল ভাবেই ভোজন পর্ব সারে প্রায় পঁচিশজন লোক।

অনাদি মাধবীকে বলে—আর ভয় করছে না তো?

মাধবী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ময়ূরাক্ষীর তীরে যে লতা মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, সেই লতা জড়াতে জড়াতে এসে কালীঘাটে ডাল পেল, পেল মাচা।

—কত লোকের আয়োজন করেছ?

মাধবী জিজ্ঞাসা করে। এখন সে অনেক আপন।

—প্রায় দুশো হবে।

—অনেক খরচ তো?

—হোক না। সকলেই সাক্ষী থাক আমাদের এই বিয়েতে।

—তার আর কি প্রয়োজন?

—প্রয়োজন আছে।

—তোমার তো অনেক খরচ হয়ে গেল। বাবা তো কিছুই দিতে পারল না।

—আমি তা জানি, উনি দিতে পারবেন না। আমি তোমার থেকে আরও সুন্দরী, আরও বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে পারতাম, কিন্তু করি নি। কেন জান?

—কি করে জানব ?

—সততার মূল্য দিতে। তুমি একটা কথা মনে রাখবে, যারা সৎ, যারা ভাল, যত কষ্টই তাদের আসুক না কেন, মানুষের দৃষ্টি তাদের উপর থাকবেই।

—আমরা সব কিছুই বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। আমাদের জন্য বাবা কষ্ট করেছেন সীমাহীন।

গাড়ী চলতে থাকে। দুইজনের কথা হয় চলন্ত গাড়ীতে।

—কালকে কি রকম খরচ হবে ?

—প্রায় দশ হাজার টাকা।

—দশ হাজার !

—তোমার জন্যে বেশ কয়েকটি অলংকারও করাতে দিয়েছি। কালকে তোমাদের না জানিয়ে আমি এবং বৌদি গিয়েছিলাম সেনকো-তে।

—কেন এতো করলে ? কষ্টের মধ্যে জীবন কাটানোতে এক আনন্দ আছে। দারিদ্রের মধ্যে একজন শিল্পীকে সেবা করা আমার ব্রত।

—মাধবী, তোমার কোয়ালিফিকেশনের তুলনায় তোমার জ্ঞান অনেক বেশী।

—অর্থের জন্য পড়তে পারি নি। তবে বিভিন্ন বই পড়েছি। ম্যাগাজিন পড়েছি।

—আজ থেকে তুমি যে বই পড়তে চাইবে পাবে।

—আর কি সময় পাব। তবে বাঁশিটা ফেলে দিয়ো না।

কথার মধ্যে কখন রাস্তা শেষ হয়ে যায় বুঝতে পারে না। সুন্দর ভাবে প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছে। বিশিষ্ট লোকেরা ম্যানেজ করছে। মাধবী 'কাল রাত্রি' যাপন করতে যায় বৌদির বাড়ীতে। কারণ অনাদি মাধবীকে আঘাত দিয়ে সামাজিকতাগুলোকে নষ্ট করে দিতে চায়-না।

পরের দিন সকাল থেকেই শুরু হয়ে যায় তুরুম ধুরুম। জীবানন্দ অবশ্য এই ধরনের পরিবেশে মিশেছে। কারণ তার অবস্থা একদিন ভাল ছিল। নানা পার্টিতে গেছে, সুতরাং বেশ খুশীর মেজাজে বিভিন্ন

ধরনের কাজগুলো দেখাশোনা করতে থাকে।

সন্ধ্যা হতেই খাটের মধ্যে মাধবী বসে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অনাদির পরিচিতরা আসতে থাকে। স্থানীয় লোক কম। প্রেজেন্টশনে ভরে ওঠে খাটের আশ-পাশগুলো। খাট আলোকিত করে মাধবী বসে থাকে।

সাবিত্রীর আনন্দে পরিপূর্ণ চোখ দুটো একবারের জন্য চলে যায় জীবানন্দের ছোট্ট সাইকেলের দোকানটিতে। যেখানে জীবানন্দ বালতিতে জল নিয়ে সাইকেলের লিক সারাচ্ছে। মনটা তার কুঁকড়ে যায়। মনে মনে চিন্তা করে—এখানকার এতোসব বড় বড় লোকেরা যদি কোনদিন গিয়ে দেখে!

কিন্তু জীবানন্দ বাস্তবকে কখনই অস্বীকার করে নি। সুতরাং তার কাছে ঐ দোকান এবং মাধবীর সংসার কোনটাই রেখাপাত করে না। তবে তার মেয়ে সুখী, এ আনন্দ তার হওয়া স্বাভাবিক।

খাওয়ার পর্ব চুকে যাওয়ার পর মাধবীকে নিয়ে গিয়ে বৌদি ঢুকিয়ে দেয় অনাদির বাসর ঘরে।

অনাদি বলে—বল মাধবী, তোমার কেমন লাগছে। আমি কিন্তু 'সতী' নই।

—তুমি সব সময়েই পিছন দিক থেকে এগিয়ে আস। ভাল হও না। আর আমাকে বলার কি আছে। সব জেনেই তো তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম।

—তোমার দায়িত্ব আজ থেকে অনেক।

মাধবী বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে—কাল ভোরের ট্রেনে মা বাবা চলে যাবেন। ভাড়া নেই কিন্তু।

—কাল কেন যাবেন?

—বাবার কাজ আছে। বেশী দিন থাকলে যদি দোকানে চুরি হয়ে যায়।

—তোমার বাবাকে বেশী দিন দোকান করতে হবে না। কানাই-এর কাছে চলে আসবে। তুমিও সাহায্য করবে।

াসরে মাধবী অনাদিকে দেখে—অনাদি একজন মানুষ। কত ভাল। আর পাঁচটা মানুষের মতো। অনাদি পশু নয়। অনাদি বর্বর নয়। মীনাক্ষীর সব কথা মনে পড়ে।

মাধবী শুধু তাকিয়ে থাকে অনাদির মুখের দিকে। ক্লান্ত অনাদির পা দুটো টিপতে টিপতে বলে—তোমার বাঁশির সেই সুরটা মনে পড়ছে—

"বাদল দিনের প্রথম
কদম ফুল করেছ দান"

এদিকে অনাদির বেশ কয়েকজন পরিচিতদের সঙ্গে গল্প করে রাতটা কাটিয়ে দেয় জীবানন্দ। সাবিত্রী অবশ্য বৌদির বাড়ীতে যায়। ভোর হয়ে এলে তারা বেরিয়ে পড়ে। অনাদি বার বার অনুরোধ করে। কিন্তু সাবিত্রী এবং জীবানন্দ তাকে বুঝিয়ে বলে—না গেলে সব চুরি হয়ে যাবে।

জীবানন্দ অনাদির মামাবাবুকে নমস্কার করে বলে—সব কথা তো আপনাকে বললাম, ছেলেটাকে একটু দেখবেন।

সে সময় মাধবী সাবিত্রীর গলা জড়িয়ে কান্না শুরু করে। বোধ হয় মা ছেড়ে থাকা এটা তার প্রথম। সাবিত্রীর চোখে জল আসে। অনাদি দুটো একশ টাকার নোট মাধবীর হাতে দেয়।

মাধবী মাকে দিয়ে বলে—তোমাদের ট্রেন ভাড়া।

জীবানন্দ তাড়াতাড়ি বলে—টাকা! আছে তো!

মামাবাবু বলে ওঠে—না বিয়াইমশায়, মেয়ে যখন দিচ্ছে রাখুন। ওটা রাখতে হয়। তারপর কানাইকে বলেন—যাও, ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো।

সাবিত্রী দেখে মাধবী চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। জীবানন্দ কোনভাবে চোখের জল লুকিয়ে রাস্তা ধরে।

মাধবী বলে—আবার এস বাবা। মা···

রাস্তায় নেমে পড়ে তিনজনে। কিছু দূর যাওয়ার পর নিজেদের একটু সামলে নিয়ে জীবানন্দ বলে—খারাপ হল না। মাধবী সুখী

হবে।

সাবিত্রী বলে—আমাদের ভাগ্যে যা হবার হোক, ছেলে মেয়ে দুটো তো সুখী হোক।

কানাই চুপ করে থাকে। সে স্বল্পভাষী।…

তারপর টিকিট কেটে ট্রেনে উঠতেই…

ট্রেনটা ছেড়ে দেয়। কানাই-এর মুখটা আর দেখা হল না।

শুধু একটা কথা যেন কানে আসে—চিঠি দিও।

—